KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : শিশির ঘোষ
Title চিত্রবীক্ষণ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৭/১ ৪৭/২ ৪৭/৩ ৪৭/৪ ৪৭/৫	Year of Publication May 1986 Jun 1986 July 1986 Sep 1986 Oct 1986
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : অরুণ ঘোষ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

অকটোবর
১৯৮৬
শারদ সংকলন

'হিংসার বদলে' : ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলার আদর্শগত পন্থা নিয়ে গভীর ভাবনা

'আধুনিক বাঙলা চিত্রশিল্প আর গ্রাফিক আর্টস'—রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

'দুর্গাপূজায় আধুনিকতা'—সমাজতাত্ত্বিকের চোখে দুর্গাপূজার ক্রমবিবর্তনের মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ

'ক্যাসেট পাইরেসি প্রসঙ্গে'—দিনেন্দ্র চৌধুরী

ধারাবাহিক উপন্যাস 'অলীক মানুষ'—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বড়ো গল্প 'এক টুকরো চিঠি'—আবুল বাশার

সাম্প্রতিক ইরানি ঔপন্যাসিক এসমাইল ফাসিহ্-র Sorraya in Coma-র আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অমিতাভ বুদ্ধদেব—গৌতম নিয়োগী

The Truth Unites : সমর সেনের সম্মানে সংকলিত প্রবন্ধসংকলন—কিরণময় রাহা

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ৬
অকটোবর ১৯৮৬
আশ্বিন ১৩৯৩

হিংসার বদলে ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৪০৭

আধুনিক বাঙলা চিত্রশিল্প আর গ্রাফিক আর্টস রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ৪৬১

দুর্গাপূজায় আধুনিকতা অনিরুদ্ধ চৌধুরী ৪৭৭

গঙ্গাসাগর লোকনাথ ভট্টাচার্য ৪১৩

এক টুকরো চিঠি আবুল বাশার ৪৩১

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৪৬৭

গ্রন্থসমালোচনা ৪৮৪

কিরণময় রাহা, রশীদ-আল ফারুকী, কমলেন্দু ধর

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৪৯০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অমিতাভ বুদ্ধদেব গৌতম নিয়োগী

বিশ্বসাহিত্য ৪৯৮

বুদ্ধিজীবীর মৌষলপর্ব সৌরীন ভট্টাচার্য

সংগীত ৫০৩

ক্যাসেট পাইরেসি দিনেন্দ্র চৌধুরী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturere of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle poke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &

MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED

JAPAN

হিংসার বদলে

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশের দিকে তাকালে, বিশেষ করে পানজাবের কথা ভাবলে অবশ্য তা মনে হয় না, কিন্তু বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় সম্প্রতি যে ভাঁটা পড়েছে সেটা খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। তার কারণ সম্পর্কে নানা মত থাকতে পারে, ব্যাখ্যা নানারকম হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর দেশে-দেশে বোমা-বিস্ফোরণ, বিমান-ছিনতাই, নির্বিচার প্রাণনাশের সুপরিকল্পিত ঘটনার কথা যে গত কয়েক মাস ধরে শোনা যাচ্ছে না, তাতে সন্দেহ নেই।

মারকিন সূত্র থেকে পাওয়া একটা হিসেব অনুযায়ী, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫-র শেষ পর্যন্ত ১০ বছরে বিশ্বে ৬,২০০টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে ; তাতে ৪,৭০০ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়, জখম হয় ৯,০০০-এর বেশি। শুধু ১৯৮৫-তেই মারকিন সরকারের হিসেবে, ৮১২টি ঘটনা ঘটে, মৃত্যুর সংখ্যা ৯২৬, এবং এই সংখ্যাটি হল আগের বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি, এবং আগের পাঁচ বছরের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি। এমন-কি, এই ১৯৮৬-রই প্রথম তিন মাসে খুন-জখমের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬২ (তার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা ফ্রানসের—৪৭)।

এই সংখ্যাগুলি যদি কল্পনাপ্রসূত বা অতিরঞ্জিত না হয়, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা যে বিশ্বে একটা উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, তাতে দ্বিমতের অবকাশ বিশেষ থাকে না। গত এক বছরের বড়ো-বড়ো ঘটনাগুলোর কথা মনে করলে অবস্থাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে : রোম এবং ভিয়েনা বিমান-বন্দরে নিরীহ ব্যক্তিদের নিধন, "অ্যাকিলি লরো" জাহাজে পঙ্গু লিয়ন ক্লিংহফারের হত্যা, এয়ার-ইনডিয়ার জেটবিমান ধ্বংস, বারলিনে রেসটুরেনটে বোমাবিস্ফোরণ। গত বছর ৯০টি দেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

সে তুলনায় এখন সন্ত্রাসমূলক ঘটনা বিশ্বে লক্ষণীয়ভাবে কম। একেবারে লোপ পেয়েছে বলা যায় না, কিংবা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে-কোনো ঢেউয়েরই একটা ওঠাপড়া থাকে ; সন্ত্রাসবাদের ঢেউও জগৎপারাবারে চিরতরে বিলীন হয়ে গেল—এমন আশা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রও করে না, এমন-কি লিবিয়ায় বোমাবর্ষণের পরেও নয়।

তবে বিশ্বে, বিশেষত পাশ্চাত্ত্য জগতে, সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, তার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশে কঠোরতর সংকল্প, এবং মারকিন বিমানের লিবিয়ায় আঘাত ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে বিশ্বসন্ত্রাসবাদের সাম্প্রতিক উদ্যমহীনতার একটা কার্যকারণসম্পর্ক থাকা সম্ভব, এটুকু স্বীকার করতেই হয়। লিবিয়ায় মারকিন বিমান-আক্রমণের

যেসব সমালোচনা আমেরিকার কোনো-কোনো বন্ধুদেশেও শোনা গিয়েছিল, তার মধ্যে একটা প্রধান বক্তব্য ছিল—এই সামরিক তৎপরতার ফলে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বিশ্বে প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, বরং আরও তীব্র হয়ে উঠবে। কেউ বলেছিলেন, লিবিয়ার খ্যাপা করনেল এতে আরও খেপে উঠবেন, হিতাহিতজ্ঞান তাঁর যতটুকু ছিল তাও বিসর্জন দেবেন, আরব ছুনিয়ায় তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ ভয় এবং প্রতিকূলতার মনোভাব চাপা পড়ে যাবে, তাঁর প্রভাব বেড়ে যাবে, শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাঁকে দমন করা আরও কঠিন হবে। এখন পর্যন্ত এইসব আশঙ্কা সত্য হবার কোনো লক্ষণ যদি দেখা দিয়ে না থাকে, তাতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় না আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না, কিংবা এখনও নেই। ভবিষ্যতের কথা কে বলবে? বিশেষত যখন সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের ভেতরকার রসায়নটা পুরোপুরি কারোরই জানা নেই?

একমাত্র পথ

তবু, গত কয়েক বছরে সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থান এবং তার সাম্প্রতিক প্রশমনে একটি পুরনো প্রশ্ন নতুন করে উত্থাপনের তাগিদ কেউ-কেউ হয়তো বোধ করবেন। লক্ষ্যে পৌঁছবার ওইটিই কি একমাত্র, কিংবা শ্রেষ্ঠ পথ ছিল?

সব যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নয়, ন্যায়-অন্যায়ের মরণপণ লড়াই নয়, এবং ন্যায়-অন্যায়ের কিংবা নানারকম স্বার্থের, ধ্যানধারণার, আদর্শবাদের একটা-না-একটা দ্বন্দ্ব সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে সব সময়েই চলছে, আপোসহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই যে সব সময় তার নিষ্পত্তি করতে হবে, তাও নয়। এই সেদিনকার আসাম-চুক্তি থেকে সুদূর ম্যাগনা কার্টা, কিংবা তারও আগে, ইতিহাসে অজস্র ছড়িয়ে আছে তার উদাহরণ। শুধু বড়ো-বড়ো যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি "ঐতিহাসিক" ঘটনার মধ্য দিয়েই যে মানুষের ইতিহাস এগিয়েছে তা নয়, তার জন্যে পথ করে দিয়েছে অসংখ্য নাটকীয়তাবিবর্জিত ছোটোখাটো বোঝাপড়া, আপোস, অপ্রিয় সত্যকে মেনে নেওয়ার মতো বুদ্ধিবিবেচনা, যা অনিবার্য তার সামনে নত হবার মতো কাণ্ডজ্ঞান।

এসব যেমন সত্য, তেমনি আবার এও সত্য—প্রবল, অনড় অন্যায়কে প্রবল শক্তি দিয়ে পরাস্ত করবার দরকার হয়। রাষ্ট্রশক্তি যখন অন্যায় করে, কিংবা যখন অন্যায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে, তখন দরকার হতে পারে তার প্রতিকারের জন্যে কঠোর সংগ্রামের। অন্যায়ের প্রতিকার করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নিজের হাতে থাকে, কিন্তু সে ক্ষমতা রাষ্ট্র যখন অন্যায়ভাবে, অন্যায় উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে, তখন, তার প্রতিকারের জন্যে, প্রয়োজন হতে পারে সেই রাষ্ট্রশক্তিকে উচ্ছেদের। এখন আবার দেশের সীমানা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক স্বার্থ-ঘটিত নানারকম সংকটের জাল বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন সাম্রাজ্যবাদ তার গরিমা হারিয়েছে, কিন্তু বিশ্বরাজনীতিতে আধিপত্য, কিংবা অন্তত অধিনায়কত্বর ধারণা দূর হয় নি। যেমন মানুষে-মানুষে, তেমনি রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রেও বন্ধন থাকলেই বরিষ্ঠ-কনিষ্ঠের একটা ভাব এসে যাওয়া স্বাভাবিক, যদি-না শক্তি-সামর্থ্যে তারা ঠিক সমান-সমান না হলেও অন্তত তার কাছাকাছি হয়। তখন একের ওপর অপরের, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হোক, প্রভাবের প্রশ্ন আসে। আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণ আমেরিকায়—যেখানেই নানা পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক স্বার্থের কিংবা স্বার্থচিন্তার সংঘাতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি লিপ্ত হয়ে পড়েছে, সেখানেই দেখা গেছে, কোনো এক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর সেই দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। উড়োজাহাজ-ছিনতাই, বিদেশে কূটনৈতিক মিশনের ওপর আক্রমণ, এক দেশে অনুষ্ঠিত ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে আগত অন্য

দেশের প্রতিযোগিদলের ওপর বোমাবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা সম্প্রতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর আক্রমণকে, যাকে বলা হয়েছে সাব-স্টেট ভায়োলেনস, আন্তর্জাতিক আকার দিয়েছে।

হিংসাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

গত কয়েক মাসে এই-জাতীয় আক্রমণের যদি একটু থিতিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে, তার মানে এই নয় যে, এ-সংক্রান্ত মূল সমস্যাটি, কিংবা একে যদি একটা ব্যাধি বলে মনে করা যায়, তার মূল কারণটি দূরীভূত হয়েছে। এমন-কি, সে ব্যাধির জড় কোথায়, কী উপায় তার নিরাময়ের, তারও কোনো হদিস কারও জানা আছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং, এইরকম একটা মত বিদ্বদ্‌মহলে এখন প্রচলিত যে, হিংসা শ্রেণীশাসিত রাষ্ট্রের মূল কাঠামোর মধ্যেই বিরাজমান ; হিংসাই তার ব্রহ্মা, হিংসাই তার বিষ্ণু, এবং হিংসাই মহেশ্বরের রূপ ধরে তাকে ধ্বংস করবে।

তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রই সর্বপ্রধান হিংসাচারী, রাষ্ট্রশক্তিই হিংসাচরণের ওপর স্থাপিত, অতএব তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, যারা ক্ষমতাবঞ্চিত তাদের পূর্ণ অধিকার আছে, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী তাদেরকে হিংসার সাহায্যে ভূপাতিত করার।

এই তত্ত্বটি যদি পুরোপুরি মেনে নিতে হয়, তাহলে কত দিনে রাষ্ট্রক্ষমতার বৈপ্লবিক হস্তান্তর ঘটে, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না, যদি-না সেই বৈপ্লবিক বিপর্যয় ত্বরান্বিত করার কাজে লেগে পড়তে চাই। তারপর, যেই সে বিপ্লব সম্পন্ন হল, সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হল নতুন ক্ষমতাভোগীদের বিরুদ্ধে নতুন ক্ষমতাচ্যুতদের, কিংবা ক্ষমতাবঞ্চিতদের নতুন সংগ্রাম। অবশ্য, বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে ক্ষমতা হাতে পেয়ে যাবেন সর্বসাধারণ, কাজেই তখন আর রাষ্ট্রশক্তির হিংসাচরণের কোনো কারণ থাকবে না, এ কথা, এতখানি বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর, এখনও যদি কেউ সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করেন, বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই কল্পলোকবিহারীর, সেই নেভার-নেভার-ল্যানডের অধিবাসীর নাগাল পাওয়াই মুশকিল হয়, তাঁর ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা।

অত দূর না গিয়ে, অনেকে বলেন, (ক) রাষ্ট্রীয় অন্যায় অবিচার অত্যাচার নিপীড়ন থেকে (খ) উপরাষ্ট্রীয় হিংসার উৎপত্তি, অতএব (ক)-এর অবসান হলে (খ)-এরও অবসান হবে। (ক) না থাকলে (খ)-এর প্রয়োজন ফুরোবে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরোবার পরেও প্রয়োগ যদি না ফুরোয়? হিংসা যদি উপলক্ষকে, এমন কি লক্ষ্যকেও, ছাপিয়ে ওঠে? তখন তাকে দমন করা রাষ্ট্রশক্তির নির্ধারিত কর্তব্য, এ কথা মানতেই হয়। এখন, মুশকিল হচ্ছে, রাষ্ট্রযন্ত্র বৃহৎ এবং জটিল, তার কর্মক্ষেত্র বিশাল এবং বহুধাবিস্তৃত, বহু স্তরের বহু ব্যক্তি ও জনসম্প্রদায়ের ভালোমন্দের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়। অনেক সময় তাকে ছুটি ভালো-র একটিকে বেছে নিতে হয়, ছুটি মন্দ-র মধ্যে একটিকে বাছতে অনেক সময় সে ব্যর্থ হয়। (এখনকার মতো ধরে নেওয়া যাক, সে রাষ্ট্র সর্বহারা-শাসিত না হলেও কল্যাণপ্রয়াসী।) এরকম ক্ষেত্রে, তার উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক, তার কর্তব্যনির্ধারণে ভুল হতে পারে, পন্থানির্বাচনে ভুল হতে পারে। ফলে হয়তো দেখা গেল, সমাজদেহের কোথাও কোনো অংশে জমে উঠল অন্যায়, বঞ্চনা। কিংবা ভুল যদি নাও হয়, অবস্থাবিশেষে, কিংবা অবস্থাবৈগুণ্যে সঠিক পদক্ষেপও অপরিহার্য দুঃখকষ্টের কারণ হতে পারে সমাজের বৃহৎ অংশের। তখন, সেই দুঃখকষ্টের সুযোগ নিয়ে, কিংবা সত্যি-সত্যিই সেই দুঃখকষ্টের তাড়নায় ধৈর্য হারিয়ে, যদি হিংসাত্মক রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হয় সমাজের ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোনো গোষ্ঠী, কিংবা সেরকম আন্দোলনে অনুপ্রেরণা অথবা প্ররোচনা দেন কোনো সৎ কিংবা অভিসন্ধিপরায়ণ জননেতা

কিংবা গোষ্ঠীপ্রধান, তাহলে দমন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রশক্তির ওপর বর্তাবে। আসল মুশকিলটা হচ্ছে এইখানে যে, রাষ্ট্রশক্তির সেই দায়িত্বপালনের চেষ্টা যে নিপীড়নমূলক নয়, বরং যথোচিত, সে বিষয়ে সামাজিক সহমত ক্রমশই যেন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। ফলে, দেখা যাচ্ছে, (ক) না থাকলেও, কিংবা তেমন মারাত্মকভাবে না থাকলেও, (খ)-এর অভাব ঘটছে না, এবং (খ)-এর পেছনে প্রত্যক্ষ সহায়তা যত না থাক, পরোক্ষ অনুমোদন এবং প্রশ্রয় অন্তত তাত্ত্বিকভাবে এমন-কি সমাজের প্রভাবশালী মহল থেকেও অনেকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

ভ্রান্তি

শুধু তাই নয়। অধুনাতন তাত্ত্বিক চিন্তায় হিংসা যেন নিজের গুণেই, দেখা যাচ্ছে, কোথাও-কোথাও এমন একটা মহিমার আসনে অধিষ্ঠিত যে তার নিবারণ কিংবা প্রশমনের চেষ্টাটাই যেন মনে হয় অকর্তব্য। বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসার প্রয়োগের সমর্থন নতুন কিছু নয়—মার্কসে তা আছে, ম্যাকিয়াভেলিতে আছে; যদিও সে প্রয়োজন কত দূর সিদ্ধ হয়েছে শেষ পর্যন্ত, যা অভীষ্ট ছিল তা কতখানি কাছে এসেছে, সে প্রশ্নের মীমাংসায় আগ্রহের অভাব লক্ষ করবার মতো, বিশেষ করে যাঁরা মতাদর্শে হিংসাকে উচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন।

আসলে, আমাদের চিন্তায় আর কল্পনায় হিংসা মস্ত বড়ো একটা ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। হিংসার মধ্যে এমন একটা নাটকীয়তা থাকে, এমন প্রবল প্রশ্নাতীত আমাদের চেতনায় তার আঘাত যে মনে হয় তার পরে বুঝি আর ভাবনার কিছু থাকল না। এ যেন এমন এক চিকিৎসা যার কোনো 'সাইড এফেক্‌ট্‌' নেই। বড়ো পরিচ্ছন্ন, বড়ো মসৃণ মনে হয় তার অস্ত্রোপচার।

হায়, শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?

জানি না তা নয়, কিন্তু মনে থাকে না—যত প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজে হিংসা করে দিয়ে গেল বলে আমরা মনে করি, তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক সুদূরপ্রসারী প্রশ্ন সে রেখে গেল ভবিষ্যতের জন্যে। অধিক থেকে অধিকতর হিংসার পথে সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে মানুষ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে ফিরে যাবার আশা, মনে হয় যেন অলীক স্বপ্ন। শুধু অলীকই নয়—প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক দৃশ্য আর কী হতে পারে? হিংসায় যত আমরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি ততই গভীরতর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরছি সেই হিংসাকেই। এখন বিরোধ মানেই যেন হিংস্র সংঘাত, কোনো দ্বন্দ্বের নিরসনে প্রতিপক্ষের শুভবুদ্ধি কিংবা বিবেকবোধ কিংবা বিচারশক্তি কোনো সহায়তা করতে পারে, এই কথাটাই এখন যেন পলায়নী মনোবৃত্তির কথা। এখন প্রতিপক্ষ মানেই শত্রুপক্ষ।

কার্যক্ষেত্রে যে সব সময় আমরা এই তত্ত্বটাকে মানি, তা নয়। তা না হলে সংসার অচল হত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসম্ভব হত। শুধু বাড়ির কাজে কর্ত্রী এবং কাজের লোক নয়, ছোটোবড়ো কারবারেও মালিক-কর্মচারীতে নানা রকমের বিরোধ অহরহ মিটছে, বিশ্বরাজনীতিতেও প্রধান-প্রধান প্রতিপক্ষ নানা ধরনের বিবাদ, স্বার্থের নানা দ্বন্দ্ব পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ না করেই মিটিয়ে নিচ্ছে—কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে। আসলে, গৃহাঙ্গনেই হোক আর বিশ্বরাজনীতির অঙ্গনেই হোক, শুভবুদ্ধি কিংবা বিবেকবোধ কিংবা বিচারশক্তি, যাই বলুন, যেমন আমার মধ্যে তেমনি আমার প্রতিপক্ষের মধ্যেও অল্পবিস্তর ক্রিয়াশীল থাকবে, আমরা ধরে নিই, এবং সেইভাবেই আমরা এগোই—অপরিহার্য সংঘাতের দিকে নয়, সম্ভবপর সহমতের দিকে। অমসৃণ প্রস্তরখণ্ডের যুগ থেকে এই আন্তর্মহাদেশীয় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের যুগ পর্যন্ত মনুষ্যজাতি এইভাবেই নিজেকে ধরাধামে টিকিয়ে রেখেছে। (অবশ্য শক্তির ভারসাম্যের মতো কিছু একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে খুব সহায়ক হয়ে থাকে, এ কথাটাও ভোলবার নয়। যাকে বলা হয় "এনলাইটেনড সেলফ-ইনটারেসট" তা একটু কম "এনলাইটেনড" হলেও সেক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক মনোভাব সংযত করে।)

উচ্চ-চাপ হিংসা

কিন্তু দলীয় এবং গোষ্ঠী রাজনীতিতে এবং রাজনীতি-প্রভাবিত সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উচ্চ-চাপ হিংসার প্রকোপ গত কয়েক বছরে যেরকমভাবে মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে, তা নিয়ে কোনোরকম দুশ্চিন্তা দূরে থাক, এমন একটা "এই-তো-চাই"-গোছের মনোভাব সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবী মহলে ছড়িয়ে পড়েছে যে সেটাই একটা চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠবার কথা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তেমনি, যাকে বলা হয়েছে "সাব-স্টেট ভায়োলেনস" সন্ত্রাসবাদের রূপ নিয়ে যতই সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে থাক, নৈতিকতার দিক থেকে যে তাতে আপত্তির কিছু আছে সে বিষয়ে, আগেই বলেছি, চিন্তাবিদদের মধ্যে অনৈক্য লক্ষ করবার মতো।

তবে, নৈতিকতার বিচার যাই হোক, কার্যকরতার বিচারে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সম্প্রতি যে পিছু হটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। অতর্কিত আক্রমণে চমকে দেওয়া, শ্লথগতি শাসন-ব্যবস্থাকে এখানে ওখানে বেকায়দায় ফেলা, সাময়িকভাবে আতঙ্কের সৃষ্টি করা, বন্দীর প্রাণের বিনিময়ে কোনো রাজনৈতিক মূল্য আদায় করা—এই-জাতীয় সাফল্য অতিপরাক্রমশালী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও জনকয়েক সন্ত্রাসবাদীই বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে; আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা জটিলতা, নানা বিরোধের সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রয়াসকে ব্যাহত করতে পারে। কিন্তু সে কত দিন? আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিমেয় শক্তি ক্রমে নিজেকে সন্ত্রাসবাদদমনে করতে শেখে, পরস্পরের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ, স্বার্থের নানা দ্বন্দ্ব পাশে সরিয়ে রেখে সন্ত্রাসবাদদমনে সহযোগিতা আরম্ভ হয় রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রীয় "ভায়োলেনস"-এর সামনে উপরাষ্ট্রীয় ভায়োলেনস কত দিন দাঁড়াতে পারে, যদি-না রাষ্ট্রশক্তি আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নিজের কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসে থাকে, যদি-না জনসমর্থন সে ব্যাপকভাবে খুইয়ে বসে থাকে?

অথচ রাষ্ট্রশক্তি অন্যায় করতে পারে, ক্ষমতাসীন দল কিংবা গোষ্ঠী ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে কিংবা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার করতে পারে, অজ্ঞতাবশত কিংবা তাচ্ছিল্যভরে প্রধানত মানুষের অধিকার আর মর্যাদা, মানুষের স্বাধীনতা, এমন-কি তার রুজিরোজগারের ওপরও আঘাত করতে পারে। সরকার অযোগ্য হতে পারে, অপদার্থ হতে পারে, অত্যাচারী হতে পারে। তখন, মানুষ যেহেতু মেরুদণ্ডহীন প্রাণী নয়, তেমন রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াবে, এই তার যোগ্য আচরণ। সে অন্যায়কে প্রতিরোধ করবে, সত্য বলে যা বিশ্বাস করে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে। এই তার কাছে প্রত্যাশিত।

লক্ষ্য পরিষ্কার, কিন্তু উপায়?

লক্ষ্যটা এখানে পরিষ্কার: যে অন্যায় গায়ের জোরে রাষ্ট্রীয় শক্তি জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, কিংবা চাপিয়ে দিতে চলেছে, তার অবসান, অথবা নিবারণ। অভীষ্টের দিকে অগ্রগমনে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি গায়ের জোরে বাধা দিচ্ছে, তার পরাভব। যা মন্দ তার পরাভব, যা ভালো তার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কী উপায়ে? হিংসার দ্বারা। হিংসার বলে প্রতিপক্ষ যখন আমার চেয়ে বলীয়ান, তখন? তখন কি আমি পরাজয় স্বীকার করব? না-কি, প্রাণবিসর্জন দিয়ে ভবিষ্যৎ যোদ্ধাদের জন্যে দৃষ্টান্ত রেখে যাব? একদিনের সংঘর্ষে যে পরাজিত হয়, শেষ

পর্যন্ত যুদ্ধে সে জয়ী হতে পারে অবশ্যই, কিন্তু পৃথিবীতে এমন ঘটনা খুবই বিরল যে রাষ্ট্রশক্তি যখন বদ্ধপরিকর, নিজের লক্ষ্যে অবিচল, উপরাষ্ট্রীয় হিংসা তাকে টলাতে পেরেছে। সামরিক অভ্যুত্থানের কথা অবশ্য আলাদা।

দ্বিতীয়ত, হিংসার দ্বারা সাফল্য যদি আসেও, সে আরও কী কী নিয়ে আসে তার সঙ্গে, তার পরিচয় পেতে কি আমাদের এখনও বাকি আছে? হিংসায় যা লাভ করি তাকে বলা যায় একটা প্যাকেজ ডীল। যেটি তাই তার পেছন-পেছন আসে সেটি দৃষ্টির-সীমা-পেরোনো সারি-দেওয়া অমঙ্গলের দল। আসে ক্রমবর্ধমান হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ভয়। হিংসা প্রতিষ্ঠা করে যে নীতি, তার নাম—জোর যার মুলুক তার। কাজেই প্রবলতার হিংসা যখন এসে দাবি করে তাকে ক্ষমতার আসন ছেড়ে দিতে হবে, তখন কোন্ যুক্তিতে সে দাবি অস্বীকার করব?

তৃতীয়ত, পারস্পরিক হিংসা পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথা বলে না, তার মুখে ভাষা নেই। অ্যারিসটটলের দেওয়া মানুষের দুটি সংজ্ঞা অতিবিখ্যাত: মানুষ রাজনৈতিক জীব, এবং মানুষ এমন যার বাক্‌শক্তি আছে। হিংসা যেমন মানুষের বাক্‌রোধ করে, তেমনি মানুষকে রাজনীতির বাইরে নিয়ে আসে। রাজনীতি মানে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, নিজের মতের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপক্ষকে স্বমতে নিয়ে আসার চেষ্টা। একটি মৌল সিদ্ধান্তের ওপর সে স্থাপিত: মানুষ বিচারবোধসম্পন্ন, বিচারপরায়ণ জীব। হিংসা তা অস্বীকার করে, বিচারের কোনো অবকাশ রাখে না। সে যখন মানুষকে পরস্পরের কাছে আনে, তার হাতে থাকে ছুরি, পিস্তল কিংবা বোমা। সে সান্নিধ্য নিয়ে আসে দুস্তর ব্যবধান।

অথচ মানুষকে যদি শ্রেণী- অথবা গোষ্ঠী-স্বার্থচালিত হিসেবে না দেখে সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখতে হয়, তাহলে কিছু বোধশক্তি তার মধ্যে থাকতে পারে, সে সম্ভাবনা একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। হিংসা দিয়ে তাকে কাবু না করে, তার বুদ্ধিবিবেচনা, তার মানবিকতাগুণের বদ্ধ দরজায় ঘা মেরে সাড়া পাওয়া যেতে পারে, এ সম্ভাবনা মনে রাখতে হয়।

এসব কথা যদি অলীক কল্পনাবিলাসের মতো শোনায়, তার কারণ, এখন ধরে নেওয়া হয়, হিংসার পথ পরিহার করা মানেই প্রবলের কাছে আত্মসমর্পণ, কিংবা বড়ো জোর আবেদন-নিবেদন, ক্রন্দন। অহিংসাও যে একটা প্রবল শক্তি, এবং সে শক্তি যে অদম্য প্রতিরোধের উৎস হতে পারে, গান্ধীর মৃত্যুর পর তা আমরা কি সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছি? আগেই বলেছি, শক্তির একটা ভারসাম্য ব্যতিরেকে সসম্মান সহাবস্থান যদি অসম্ভব নাও হয়, তার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

গান্ধী যে সত্যাগ্রহের পথ দেখিয়ে গেছেন নিরস্ত্র জনসাধারণকে, তা এমন এক শক্তির সন্ধান দিয়েছে, যার সম্মুখীন হলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আধুনিক রাষ্ট্রীয় শক্তিও, প্রকৃত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, থমকে দাঁড়ায়, নিজের ভিতরকার দুর্বলতার সন্ধান পায়—বিবেক, বুদ্ধির বদ্ধ দরজা একটু খোলবার প্রয়োজন বোধ করে।

এই প্রবন্ধের রচনাকাল অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ।

গঙ্গাসাগর

লোকনাথ ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

এই ক্ষণটি আমাদের দুর্লভতম। পরে কী হবে, তা ভাবলেই বুক দুর-দুর। ভাবব না।

নিশ্বাস সমান হয়েছে সহচরগণ? এসো মাটিতে ব'সো। দেখছি, যেমন আমার, তেমনি তোমাদেরও, চোখে উঠছে তরঙ্গ। ছেড়ে দাও স্রোতে, নিজেদের। এ-গ্রামে গোধূলি এখন, সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের সময়ের নদী। দুঃখের রাঙা ছটায় আকাশ উদ্ভাসিত।

আগে পোশাক বর্জন, আসন্ন অন্ধকারের অতলস্পর্শ জলে বিসর্জন দাও প্রতিমা। পোশাকের ভিতরে আছে পোশাক, কত কীট কিলবিল, অলিতে-গলিতে গুপ্তচর, দুর্মর শত্রুসেনা। কত অভিমান, হুমকি-হুংকার। তাদের বিসর্জন চাই, কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনিতে, নীড়ের পথে ধাবমান বিহঙ্গের কিছু শেষ কাকলীতে।

চোখ ফুটছে ঘরের বাসিন্দাদের, পেরেকে লটকানো হাতপাখার, দেয়ালে টাঙানো ছবির। সবাই চেয়ে আছে আমাদের দিকে, রুদ্ধ নিশ্বাস। কোন্ সংলাপ আরম্ভ হল ব'লে, মৃদু মন্দ ঝংকারে, নীরবতার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে।

আমাদের প্রণাম পূর্ব দিকে, আমাদেরই মৃত্যুকে। পশ্চিমে, অন্ধকারের আহ্বানকে। উত্তরে প্রণাম, প্রপিতামহ অহংকারকে। দক্ষিণে, যুদ্ধশেষে পরাজয়কে, আত্মলুপ্তিকে।

ঈশানে রাত্রি, প্রিয়ার সঙ্গধন্যা। অগ্নিতে, সকল প্রতিশ্রুতির হনন চোখ-ঝলসানো বল্লমে, অকস্মাতের বজ্রে। নৈঋতে, ঝড়ের শেষের উষা, চিরন্তনী, জ্যোতির্ময়ী। বায়ুতে, প্রিয়ার নিশ্চিহ্নতা।

গড় হও চার বার, একে-একে এদের প্রতিটির প্রতি। নাক যেন ছোঁয় মাটি, চোখ আর কিছুই দেখে না। এ-আত্মসমর্পণ কতখানি সম্পূর্ণ হল, তারই উপর নির্ভর করবে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ।

ঊর্ধ্বে আমাদের নমস্কার বিস্মৃত শতাব্দীর পুরীকে; অধঃতে, দূর হতে দূরান্তরে বিলীয়মান স্বপ্নের শরীরকে।

দশ দিক বন্দনার শেষে, আবার নমস্কার, আর কিছুকে নয়, শুধু নমস্কারেরই নিরবচ্ছিন্ন চেতনার প্রতি। একটি ক্ষণ ঐক্যে গমগম, একটি ভঙ্গি, একটিমাত্র। গঙ্গাসাগরসঙ্গম।

আরে! এত ক'রেও, তবু চলতে চাই?

শুনছি বুক দুর-দুর, না?

হায় রে অকৃতার্থেরা! বেশ, দরজা খোলো। দেখা যাবে, যা দেখার আছে।

পিতৃপুরুষের পুরী

প্রতীক্ষার এই ক্ষণে ভয়। যদি সে না আসে?

শেষ বাঁশি মিলিয়ে গেলে পথে-পথে, কখন আরতির ঘণ্টা বেজে উঠবে মন্দিরে। তখনো, তখনো যদি সে না আসে? কথা বাসি হবে এই ঘরে, শিশুর মুখ শুকিয়ে উঠবে—যদি সে না আসে তখনো?

আমায় ঘিরে রয় ফুলের অজস্র মৃত্যু, স্বপ্নের শ্মশান। তবু, দৃষ্টির অগোচরে তারা, দরজার বাইরে, বাগানে, বা যা হয়তো একদিন বাগান ছিল—এখানে নয়। এখানে ছোট্ট পরিসর, পরিপাটি, সকল ছিদ্র বন্ধ অতি যত্নে, অতি প্রেমে। নিস্তব্ধতা খেলা করে, আপনভোলা শিশু। দেয়ালে-দেয়ালে সাজানো ইমারত, দুর্গের প্রাচীর। কল্পনায় অস্তসূর্যের ছটা, খেয়ালে-খুশিতে বিভোর পুরী।

বাইরেও, এই মুহূর্তে, সূর্য কি অস্ত যায়? আরতির ঘণ্টা বেজে উঠতে পারে কোন্ মন্দিরে—কোথায়, কত দূরে?

যদি সে না আসে?

তাকে খবর আমি পাঠাইনি, তার জানারও কথা নয়, এই ঠিকানা। গোঁয়ারের চূড়ান্ত, পেরিয়ে আসি পথ চোখ বন্ধ করে, যাতে নিজেও জানতে না পারি কোথায় এলাম, কোন্ মোড় কোন্খানে নিয়ে, কোন্ নীল বা লাল বাড়ি ডাইনে বা বাঁ হাতে রেখে। তবু চলতে-চলতে মনে হতে থাকে, সঙ্গীত বেজেই চলছিল, পৌছোচ্ছি প্রার্থিত গন্তব্যে। পথ শেষ হল যেই, কারণ ধাক্কা খেলাম, তখনই চোখ খুলি। দেখি দরজা, যা ছুঁতে না ছুঁতেই উন্মুক্ত, পরে সিঁড়ি উঠে গেছে ঘুরতে-ঘুরতে। পরে, সিঁড়িরও শেষ, যেখানে আরো এক দরজা—আর সেই দরজা পেড়িয়েই এই ঘর।

না দেখেই সব দেখেছি, তাই বললাম বাগানের কথা, বা সেখানে কী আছে বা না আছে। পাড়লাম মন্দিরেরও প্রসঙ্গ। এত স্থিরতা জন্মায় শুধু চোখ বুঁজে চলাতেই। সে আসবে, যদিও ঠিকানা জানাইনি, সেই স্থিরতাও পেয়েছি ঐ চোখ বুঁজে চলাতে।

নিশ্চিত জানি, আমায় ঘিরে রয় ফুলের অজস্র মৃত্যু। স্বপ্নের শ্মশান কথা কয় বিস্মৃত শতাব্দীর।

এটাও ব'লে দিই, না দেখেই, এও এক পাষাণ-পুরী, সৌধ-মিনারের, দুর্গ-প্রাচীরের, যারই এক বাড়িতে এই ঘর। এখানে মরতে আসে ওর পিতৃপুরুষেরা, অনেক পথ ভেঙে, কাঁধে বোঁচকা নিয়ে—রাত্রির সাধ তাদের ঘর্মাক্ত দেহে গুঞ্জন তুলেছিল। পরে একে-একে, আগুন-নিভিয়ে-দেওয়া ফুঁয়ে, সকলেই হয়েছে নিশ্চিহ্ন—তাদের ভস্ম মিশে গেছে ধুলায়-ধুলায় সূর্যাস্তের রঙে।

তাই কি সে আসবে না?

এত স্থিরতায় এই সন্দেহ, যা নিয়ে খেলা করতে ভালো লাগছে—তাই ভাবছি. আসবে, কি আসবে না? যেন বলতেও ইচ্ছা করছে, না-না নারী, এসো না, এসো না। আরতির ঘণ্টা বেজে উঠুক, বেজে যাক—বাজার পরে থেমে যাক। মন্দির মিলিয়ে যাক তমিস্রার নদীতে।

আমি ব'য়ে এনেছি তোমার পিতৃপুরুষদের, জাগিয়ে রেখেছি তাদের এই ঘরে, সাজানো ইমারতে—আমার এই প্রতীক্ষার ক্ষণে। নিস্তব্ধতায়, কান পাতলে শোনা যায়,

কোনো এক শিশু নাড়াচাড়া করছে খেলনা, আপনভোলা।

মরুভূমির মধ্যাহ্ন

পাষাণপুরীতে হারিয়ে আছে নারী। বন্ধ রাত্রির প্রলাপ তার মনে, পলিমাটির প্রলেপের মতো জ'মে-জ'মে, এখন শক্ত শিলা। যতই ভিতরে যাও, স্তর ভেদ ক'রে অন্ধকার আরো ঘনীভূত হয়েছে—দিনরাত্রির গুঞ্জন স্তব্ধ হয়েছে যেন কোন্ শতাব্দীতে।

তাই নারী চেঁচিয়ে ওঠে যখন, শোনাও যায় না। যেটুকু স্বর বেরোয়, গুমরে মরতে থাকে অন্ধকারের কূপে। চোখে তার এখনো জাগে অনন্ত উষার স্বপ্ন, ঘ্রাণে যেন পায়, হঠাৎ-হঠাৎ, কনকচাঁপার গন্ধ। আর তখনই, সে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

সেই আর্তনাদে ফুলঝুরির ফোয়ারার মতো ছিটকে ওঠে সৌধ-মিনার, সূর্যাস্তের আকাশ—চিরন্তনী রাত্রি কাঁপে বিদ্যুৎ-বহ্নিতে। পরেই আবার, একই অন্ধকার, এত অতল কূপ যে শুকনো পাতা যদি

ঝরে, ঝ'রেই চলে, পড়ার শব্দ শোনা যাবে না। আলিস্যি ভেঙে, প্রাণের সাড়া তুলে, বহু যুগের ঘুম হতে সদ্য জেগে উঠেছিল সেই নারীর দয়িত যে-সুঠাম পুরুষ, সে আবার ধরাশায়ী হয়, নিমেষেই হাত-পা এলিয়ে মৃত, চক্ষু মুদ্রিত।

অনেক শব্দ উঠেছিল ফোয়ারার স্ফূর্তিতে—বীণার ঝংকার, শিশুর কান্না—নীরবতা তাদের হঠাৎ গলা টিপে মারে। বন-বনানী, জনপদ, পথ চ'লে যায় প্রান্তর হতে গিরিতে—সব, সব, একবার জেগেই, মিলিয়ে যায় রেখাহীন শূন্যতায়। স্বপ্নের পাপড়িগুলি ঝ'রে পড়তে না পড়তেই দমকা হাওয়ায় উধাও হয়। পরে হাওয়াও উধাও। কোনো চিহ্ন নেই কিছুর, গুমট শান্তি।

পাষাণপুরীতে হারিয়ে আছে নারী, অতিরিক্ত উতলা, বদ্ধ রাত্রির প্রলাপ তাকে পাগল করেছে।

আমরা চলেছি দুর্গের প্রাচীর ঘেঁষে, গন্তব্য এখনো অনেক দূর। মধ্যাহ্নের সূর্যে আমাদের শিরায় তৃষ্ণা। সন্ধ্যায় পৌঁছোব সরোবর, এই অভীপ্সা খেলা করে চোখে—এত ক্লান্তিতেও তাই হাঁটুতে-হাঁটুতে সামনের পথের গুঞ্জরিত আহ্বান বেজেই চলে।

এরই মধ্যে, উষ্ণ নিশ্বাসে, ক্লান্তিতে-অভীপ্সায়, যেন কখনো-কখনো শুনি আর্তধ্বনি। একটু সংকেত মাত্র, পরেই স্তব্ধতা।

তখনই আমরাও যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট, তাকাই একে-অন্যের দিকে। এ কি তবে সেই শৈশবে শোনা গল্পটাই, পাষাণপুরীর নারীর যন্ত্রণা, যার কথা বলতেন ঠাকুমা-দিদিমা বর্ষণঘন সন্ধ্যায়? কে জানে, হয়তো সত্যিই আছে সেই নারী—অন্তত সেই দিব্যিই দিতেন প্রপিতামহীরা, আজ মনে পড়ছে। তবে কি পাশ দিয়ে চলেছি আজ তেমনই কোনো পুরীর?

যাওয়ার পথ এখনো অনেক, চোখে নাচে সরোবর—তবু একটি চিন্তার ঝিলিক মাত্র, সকলে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মরুভূমির এই মধ্যাহ্নে দেখি গুহার অনন্ত রাত্রি।

এখন কর্তব্য কী, কেউ কি তা জানে এই ভিড়ে! এত সামান্য পথিক আমরা, এত সম্বলহীন, কখনো কিছুই পাই নি—এসব ধ্বনি আমাদের কানে আজ কেন! অনর্থক শুধু অবোধ্যতা, হিজিবিজি, দৃষ্টি ঝাপসা হয় বিদেশ-বিভুঁয়ে।

নাচ

তাকেও শেষে চোখ রাঙাতে হয়, ব'লে উঠতে হয়, "কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?" ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তোমাদের ওপর।

সে, যে শান্তশিষ্টের চূড়ান্ত, কিছু চায়নি তোমাদের কাছে—তোমাদের গায়ে আঁচড়টি কাটারও অভিপ্রায় তার ছিল না। সে শুধু এসে বসে, গুঁটিসুঁটি হ'য়ে, একটু জায়গা ক'রে তোমাদেরই পাশে—কারণ একই ঘরের এটা-ওটা সামগ্রী তোমরা সবাই, এড়ানো যায় না। এড়াতে চায়ও নি সে।

আর তোমরা কী করলে? খপ ক'রে ধরলে ওকে, কেউ ওর হাতটা, কেউ বা পা'টা, কেউ বা নাসারন্ধ্রের তলায় ভ্রমরের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসলে।

তবু অত সহজে ছাড়বার পাত্র তো তোমরা নও, তাই খেলা জমছে না দেখে তোমাদের হঠাৎ নাচতে ইচ্ছে হল, ওকে নাচাতে ইচ্ছা করল। আসন থেকে হিড়হিড় ক'রে টেনে, তাকে নামিয়ে আনলে ঘরের মধ্যিখানে—পরে, বৃত্তাকারে, একে-অন্যে হাতে হাত বেঁধে, ওকে নিয়ে শুরু করলে সাঁওতালি নাচ।

আমাদের ধারণা, ও তখন কিছু কাকুতি-মিনতি নিশ্চয় করে, বলে হয়তো, "ছেড়ে দাও ভাই, একটু একলা থাকতে দাও," বা হয়তো, "আমার ভালো লাগছে না।"

"ভালো তবে লাগাচ্ছি তোমায়," এই ব'লে অন্ধ আহ্লাদে তখন হয়তো তোমাদেরি কেউ-কেউ শুরু করলে ওকে সুড়সুড়ি দিতে, এই ওর বগলে, এই পায়ের তলায়, এই কুঁচকিতে। আর সে, ধেই-ধেই নৃত্যে উন্মাদ, অত্যাচারে জর্জর, কান্নার সমান হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে-হাসতে দম বন্ধ হ'য়ে এল তার।

তেমনি কোনো এক মুহূর্তে, যখন আর পারছে না, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে নিশ্চয়—এবার প্রভুত্বের পালা তারই, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে। সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে, এসে বসে আসনে। আদেশের সুরে বলে, তোমাদেরি কাউকে, "তুমি এবার এসো দেখি নিজের জায়গায়, হও মরুভূমির বালু।" বলে অন্যকে, "তুমি হও মিনার।" বলে তৃতীয় কাউকে, "তোমাকে আমি করলাম সূর্যাস্তের আকাশ।"

মুহূর্তেই, তোমরাও হয়ে দাঁড়ালে ঠিক সেই-সেই জিনিসটি—এতক্ষণ অত্যাচার করেছ ওর ওপর, এবার ওর অত্যাচার সহ্য না ক'রে যাবে কোথায়! তবু সহজে ছাড়বে না সে-ও, তাই বলল, "বাছাধন সব, এবার নাচো তো দেখি।"

অমনি ড্যাং-ড্যাড্যাং-ড্যাং, নাচতে থাকলে তোমরা, মিনার আর মরুভূমির বালু আর সূর্যাস্তের আকাশ।

সেই নাচই চলছে এখনো—ও ব'সে নিজের আসনে, চোখ রাঙিয়েই চলেছে। ওপরে-নীচে ওঠে-নামে সূর্যাস্তের আকাশ, ডাইনে-বাঁয়ে চরকিবাজি খায় মিনার। এত মত্ত লোকটা যে হুঁশও নেই, ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছেও না যে আমরা এসে হাজির, নিমন্ত্রিতের দল, দাঁড়িয়ে আছি, স্তম্ভিত।

সব-ইতিহাস-শূন্য এই গ্রাম, এখানে মিনার কোত্থেকে এল, বিশেষত এই ঘরে, ঐ কোণটায়, যেখানে চিরকাল দেখে এসেছি বইয়ের তাক ? মরুভূমির বালু যেটা এখন, সেখানে ছিল মেঝে, সূর্যাস্তের আকাশটা ছিল সামনে দেয়াল। ঘরের খুঁটিনাটি মুখস্থ আমাদের—আজই তো প্রথম আসছি না।

ওকে কি ফিরিয়ে আনব ওর আগের স্বাভাবিকতায় ? নাকি নাচ চলতেই দেব, আমরা দাঁড়িয়ে থাকব ?

নাকি ফিরেই যাই, যেমন এসেছিলাম, তেমনি অজান্তে ?

বলা বাহুল্য, হেন প্রশ্ন পাড়ছি মুখ না খুলেই, কারণ ওর কথা তো বাদই দিলাম, মনে হচ্ছে উত্তর দেওয়ার ফুরসত তোমাদেরও নেই।

বিদেশীর বিদায়

যা দেখেছি, তা বর্ণনাতীত। যা দেখিনি, তারই বর্ণনার প্রয়াস চলে। গুহায় নামে সূর্যাস্তের সর নামে রাংতা, রক্তের নামে নুড়ি।

বুড়ী থুথ্‌ড়ী, হাড়গোড় এত ভঙ্গুর যে শুকনো পাতারও অধম, ছুঁয়েছি কি গুঁড়িয়ে যাবে। এক মেকি জগৎ, পাতাল, শূন্যের বাষ্পে দম বন্ধ হয়ে আসে। তালপাতার সিপাই, যা মিনার হতে চেয়েছিল।

একদিকে ঐ সত্য, উদ্ধত, সকল নাগালের বাইরে, মেঘের অনেক স্তর ছাড়িয়ে তার শৃঙ্গ। অন্যদিকে রাশি-রাশি কাঠের কুটো, আবর্জনা, ফিকে রঙ, এলোমেলো রেখা—ফুঁ দিয়েছি কি উড়ল।

দুই-ই বাসিন্দা এই ঘরের। একজন চিরকালই ছিল, অন্যদের আনা হয়েছে জবরদস্তি ক'রে, দিন-রাত্রি ধ'রে, জ'মে উঠেছে, ভ'রে তুলেছে দেয়াল।

আর যে এনেছে এদের, এনেই চলেছে, অকৃতার্থ কর্তা সেই কীর্তির, সে যেন কেউই নয়, বিদেশী একজন, বাইরে থেকে এসে অত্যাচার করছে। গুঁটিসুঁটি হয়ে ব'সে থাকে তাই, অপরাধ-বোধে জর্জর। দ্যাখে আবার, যা দেখেছিল, যা একমাত্র দেখার আছে এই শূন্যে-শূন্যে। পরেই, চোখ যেই যায় তার সন্তান-সন্ততির দিকে, ব্যর্থতার দীর্ঘনিশ্বাসে পঙ্গু হয় তার শরীর-মন।

আজ তাই ঠিক করেছি, বেরিয়ে যাব, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, তালা বন্ধ করব না। ঘরে তো বিদেশীই ছিলাম, আজ তো চললামই। থাক এরা দুজনে এখানে, একে-অন্যে যে-কথা বলতে চায় বলুক, বা কথা যদি সম্ভব নয়, রাজত্ব করুক নীরবতা।

হু হু হাওয়া বয় বাইরে, এত বেগ যেন বাজে বজ্রের বাঁশি, পৃথিবীর প্রান্ত উড়িয়ে নিয়ে যায় অট্টহাস্যে। পাষাণ-পুরীর দুর্গ-প্রাকারে আছড়ে-আছড়ে পড়ে কোন্‌ দানবের দল। হুংকার ভেসে আসে বন্ধ ঘরেও, কেঁপে-কেঁপে ওঠে কোনার স্তূপীকৃত ধুলা। হয়তো মুক্তি রয় মৃত্যুতে নিশ্চিহ্ন আত্ম-সমর্পণে।

তবু এ-পুরীতেও দ্রষ্টব্যের অন্ত নেই, এক অন্য দেখা সে এক, হালকা মন নিয়ে। পথ-ঘাট, কলহাস্যময় নরনারীর মিছিল, পুরাকালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। দিন যদি এখনো আজ, হয়তো রৌদ্র-ঝলমল দেবদারুর শ্রেণীও নজরে পড়তে পারে, দূরে—এত ঝড়ে নিশ্চয় তির্যক রশ্মির মতো বঙ্কিম শরীর তাদের।

আর তোমরা এখানে, এবার থাকো দুজনে, বিদেশীকে বিদায় দাও পথে। যে-তুমি সত্য, উদ্ধত শৃঙ্গ, দ্যাখো দু'চোখ ভ'রে অন্ধকার, শূন্য বাষ্প, অকৃতার্থতার স্তূপ রাংতায় আর নুড়িতে।

পরে যদি কোনোদিন অঘটন সত্যিই ঘটে, তোমাদের মিলন হয়, বিবাহ-সন্ধ্যায় বেজে ওঠে শানাই, জানি না তার ধ্বনি পৌঁছোবে কিনা দূর হতে দূরান্তরে চ'লে-যাওয়া পথিকের কানে।

তবু সে-ইচ্ছা রইল, প্রার্থনা রইল। কান প্রস্তুত থাকবে। নাম রইল না, কথা রইল না।

বিদেশী রইল না।

অষ্টোত্তর শতফুলের মালা

ঘর এখনো সম্পূর্ণ মৃত্যু নয়, কী ক'রে ছেড়ে যাবে ও ? করালবদনা দেবী, পাষাণমূর্তি, জিভ বার ক'রে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মিশে আছে তাঁর ঘন কৃষ্ণ গাত্র, কিছুই দেখা যায় না।

তবু ও হাতড়ে-হাতড়ে ঠিক ঠাওরে নিয়েছে, কোথায় তিনি রয়েছেন, কোন্‌খানে তাঁর বাঁ পা উদ্যত সামনে, ডান পা পিছনে। কোথায় বুক ভেদ ক'রে উঠেছে স্তন।

তাঁরই গলায় পরাতে হবে মালা। দিনে-দিনে সঞ্চিত করেছে সে একটি-একটি ক'রে ফুল, বা ফুল ব'লে যা তার মনে হয়েছে—যা আসলে হয়তো ফুল নয়, বিভীষিকার অট্টহাস্য, এ-ঘরেরই উপযোগী বাসিন্দা।

অন্ধকার বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে, ভীষণের নিশ্বাসই গায়ে পড়ে, তাকে দেখতে পায় না। ভাবে কোন্ বনানী-দিকদিগন্ত-সূর্যাস্তের অনবদ্য আকাশ হয়তো খোদিত হয়ে আছে দেয়ালে-দেয়ালে, শুধু চোখের আলো নেই ব'লেই ফুটে উঠছে না।

এইভাবেই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সে চ'ষে বেড়িয়েছে ঘরের মেঝে, কোণ হতে কোনায়, এক দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আরেক দেয়ালের দিকে ধাবমান। কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো নাক ঠেকিয়ে কিছু কাগজের কুচিতে, তাতে খুঁজতে চেয়ে শীতের অরণ্যের কোন্ ঝরা পাতা।

এবং আশ্চর্য, তখন সে-কাগজের কুচি তার কাছে ঠেকেছে ঝরা পাতা ব'লেই। ভেবেছে, হয়তো অনেক দিনের ব'লেই শুকনো এমন, একটু অন্যরকম স্পর্শ, আসলে কিন্তু ঝরেছে নিশ্চয় অশ্বত্থ হতেই—নাকি বটেরই পাতা?

ফুল যা সঞ্চিত করেছে, তাও হেন জাতেরই। হয়তো ঐ কাগজের কুচিরই শামিল কোনো কিছু, দুমড়ে-মুষড়ে জুঁই-মাধবীর আকার, যাতে ইঁদুরের পেচ্ছাব শুকিয়ে-শুকিয়ে এখন এক বিচিত্র গন্ধ। ও ভেবেছে, এ হয়তো বন্য কুসুম কিছু, যার স্বভাবই এমন সে কখনো তাজা ঠেকে না, তবু হেন দেবীর যোগ্য নৈবেদ্য নিশ্চয় তা হবে।

অনেক শ্রমে, অনেক যত্নে, এমন একশো সাতটি ফুল ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে দেবীর পায়—গুনে-গুনে দেখেছে সে রোজ। পূজার পদ্ধতিতে বলে, আরো একটি ফুল চাই, একটি মাত্র, নইলে কী ক'রে সে বসে মালা গাঁথবে?

সেই একটিরই খোঁজ চলছে আজ, অনেকক্ষণ ধ'রে—এখনো মেলে নি। যেন আর কিছু নেই ঘরে, এখন শুধু শূন্য, শুধু বাষ্প, থাকে আঁকড়ে ধ'রে দেবীর পায়ে আনা চলে না।

তাই শ্মশান এখনো সম্পূর্ণ নয়—পথ ডাকছে ডাকুক, এখনো আগল খুলবে না ও।

বাইরে অদ্ভুত হাওয়া আজ এক, যাত্রীর দল এসে দাঁড়িয়েছে। ওর জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যদি ভ্রমর তোলে গুঞ্জন

ফুরফুরে হাওয়া, হালকা শরীর, বদ্ধ ঘরে। উষার মাঙ্গলিক সারছি।

ঝলকিত পৃথিবী দেয়ালে-দেয়ালে, গোলাপি পর্বত। তলায় তরাই অঞ্চল, বন-বনানীর চূড়া। আরো কাছে, বইয়ের তাকে, সৌধ-মিনার।

ব'সে-বসেই, হাঁটুতে-হাঁটুতে নদীর প্রস্রবণ, যাত্রা ধানখেতের পাশ ঘেঁষে। কথা বলে কানে-কানে আমার, প্রিয়া, যে কাছে নেই, তবু যারই শরীর, উদার উন্মুক্ত উরু, এই দিগন্ত।

রাত্রিতে শেষ হয়ে গেছে সকল তর্কের পালা, শান্ত হয়েছে বুক, যার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল আকাঙ্ক্ষায়-আর্তনাদে, সন্দেহে-শঙ্কায়। এখন নীরবতা ভাসছে, এক শঙ্খচিল, আকাশে-আকাশে।

চলেছি, যাওয়ার জায়গা নেই জেনেই—সঙ্গে সম্বল যা, কাঁধের বোঁচকায় কম্বল বা মোটা শাল, তারও দরকার হবে না পথে। তবু নিয়েছি, কী জানি কোন্ খেয়ালে। হয়তো বহু অন্ধকারের অবিরাম নিশ্বাসে যে-আর্দ্রতায় অসুস্থ হয়েছে তাদের দেহ, এখন তাকে বিছিয়ে দিতে চাই রৌদ্রের প্রাঙ্গণে।

সম্পত্তি বলতে আমার তো তেমন কিছু কখনো ছিল না, তবু অর্থ-অনর্থ স্বপ্ন-হতাশা, বা ঘরের সামগ্রী কিছু, যথা চামচ বা গামলা, তাও চলেছে সঙ্গে। সকলকেই রোদ পোয়াতে হবে।

যাদের পাই নি, আজ তারা কত সহজে মূর্ত-চিত্রিত, এ-ঘরের কোনায়-কোনায়, মেঝেয়-ছাদে। যে-পুরীর অলিন্দে-বারান্দায় উঁকিঝুঁকি মারব ভেবেছিলাম, এতদিন যার চারিপাশে শুধু ঘুরেই মরেছি কাঙাল, আজ তা পাখা মেলে উড়ে এল চোখের সামনে—ঐ তো ব'সে আছে।

তাই, আর যেন ইচ্ছাও নেই একটু ঘুরি বা দেখি, কোন্ ছবি টাঙানো আছে কোথায়, বা রাজকন্যার শোওয়ার খাটে কত মণি-চুনি-পান্না জ্বলে। এইসব চিন্তা বা প্রশ্নে যত মুহূর্ত আকুল হয়েছিল আমার, তারাও আজ দ্যাখো হঠাৎ কেমন সোনার চাঁদ শিশু, পাশেই চুপটি ক'রে হাঁটু মুড়ে বসেছে, তাকিয়ে আছে চোখে—কোনো আব্দার আর নেই।

ভ্রমর উড়তে চায় তো উড়ুক, বসতে চায় বসুক—জুঁই-বেল-চাঁপার এখন আর অন্ত নেই এই কাননে। যদি গুঞ্জন তোলে, তাকে চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে দেবে না কোনো দানব। যদি বেরিয়ে যায়, তো বন্দী করতে ঝাঁপি হাতে পিছনে ছুটবে না কেউ।

গল্প তবে শুরু হোক এবার। বর্ণমালার অক্ষরগুলি স্নান সেরে, জামাকাপড় প'রে, এসে

হাজির হোক। চুড়িদার-পানজাবি, বা ধুতি-পাজামা, যে যা পরতে চায় পরুক। কিংবা সঙ্গীত যদি বলে, সে এখনো বাজবে না, তো না-ই বাজল।

একই কথা ভেরীর প্রতি, বা উৎসবের শানাই-এর প্রতি, বা নীরবতার প্রতি। কোনো দায়ে বদ্ধ নয় কেউ।

সেই কথাই তোমাদেরও প্রতি, যে-তোমরা পাড়াপড়শি, বারবার এসে ফিরে গেছ। আজ যে দরজা উন্মুক্ত ক'রে রেখেছি—এখনো কেউ আস নি, হয়তো এলো ব'লে। অথবা, হয়তো আসবে না। সে-ক্ষেত্রে, না-হয়, না-ই এলে।

ঢোল

বাজি রেখে দৌড়, বাজি নিজের সঙ্গে নিজের। যে-পথ সারা যায় পনের মিনিটে, ও তাতে নেবে পাঁচ মিনিট। সেরা দৌড়বাজ কেউ ছিল নাকি এই গ্রামে, সে নাকি নেয় সাত মিনিট একই পরিক্রমায়। ও তাকে হারাবে

সারাদিন ও ভেবেছে এই দৌড়ের কথা, ভাবতে-ভাবতে ওর পেট বাষ্পে ভ'রে উঠেছে, এখন সেটা ঢোলের মতো ফেঁপে-ফুলে বিদিগিচ্ছিরি। যা খেয়েছিল আজ ঘুম থেকে উঠে, সকাল হতে, তা টগবগ ফুটছে আগুনের পুকুরে, গুহার ভিতরে।

শেষে সকাল গড়িয়ে যখন ছুপুর এল, ছুপুর গড়িয়ে বিকেল, বনে-বনান্তে আলোর রঙ নিল বেগনির আমেজ, অন্ধকারের দূতেরা সব প্রথমে আস্তে-আস্তে, পরে জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকল, তখন কোন্ খ্যাপায় খপ ক'রে ধরল ওর টুঁটিটা টিপে—আর পারা যায় না, আর পারা যায় না, বলতে-বলতে ও বেরিয়ে এল পথে।

পরেই, কেউ দেখছে কি দেখছে না, জিতবে কি হারবে, সে-চিন্তায় একমুঠো ভস্ম ছুঁড়ে দিয়ে পা ছুটোকে করল পক্ষীরাজ ঘোড়া। কাঁপতে থাকল বন-বনানী, পথ-প্রান্তর, অপরাহ্নের ক্ষণ—নিজের বুকটা নাচতে থাকল হিমালয় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া গঙ্গা।

দেবদারুর সারি, বা আরো কাছের কুটীরের চালা, নিশ্চয় নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে দেখছে এই কীর্তি—হয়তো বলছে, প্রকৃতিতে নিয়ম ব'লে একটা ব্যাপার আছে, সম্ভব-অসম্ভব আছে, সেটাকে ভাঙতে গেলেই মৃত্যু। যেন শেষটায় বেঘোরে মারা না যায়, যেন না মরে লোকটা, হাতজোড় ক'রে হয়তো এ-কথাও বিড়বিড় করছে তারা।

ও তার উত্তরে বলে, ধুত্তোর, ছুঁড়ে দেয় একমুঠো ভস্ম শূন্যের মুখের দিকে। কতটা গেল, এখনো পথ কতটা বাকি, ঘড়ির কাঁটাটা কোথায়, এসব ভাবার বা দেখার সময় আছে ওর?

তবু ভয়ের ভাবটা ক্ষণে-ক্ষণেই জেগে ওঠে, অমনি সে মরিয়া, দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করে তার সব স্বপ্নের নাম, মনে-মনে ছুম ক'রে আওড়ে ফেলে সৌধ-মিনার, সূর্যাস্তের আকাশ, মুক্তকুন্তলা নারী শায়িতা দিগন্তে-দিগন্তে—বা এ-ধরনেরই কিছু শব্দ, কিছু ছবি কিছু কল্পনার স্মৃতি, যা তাকে চিরকাল আকুল করেছে।

এবং আওড়াতে পেরেই ভাবে, ওর উদ্ধারের জন্যে হাত বাড়াবেই ঐসব ছবি বা কল্পনা, স্বপ্ন বা স্মৃতি—যেন ওর ইষ্টদেবতা ওরা, পরশপাথর।

তবু এমনই ওস্তাদ, একদিকে ছুটছে, অন্যদিকে নিজেকে বসিয়ে রেখেছে বেড়ার প্রান্তে, দেখছে প্রান্তরে নিজের ছোটাটা কেমন চলছে। আধখানা এখানে, স্থির—আধখানা ওখানে, চলমান বিদ্যুৎ। আধখানা দর্শক, অন্য আধখানা দৃশ্য।

পৌঁছে গেল? ঘড়ির কাঁটাটা এখন কোথায়? সেরা সেই দৌড়বাজের কিংবদন্তীতে এবার ও আনল ভোলবদল?

আসলে, দৌড়টা ও এখনো আরম্ভই করে নি, পৌঁছোয় নি পর্যন্ত বেড়ার ধারে-কাছে এখনো ঘরেই ব'সে। সব ছবিটা মনে-মনে দেখছে, সকাল থেকে যেমন দেখে এসেছে, তেমনি আরো একবার।

আর পেটটা ফুলে আরো ঢোল। আরো, আরো ঢোল।

তিন ভাগ এই মেঝে

পথটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছে সে। মাঝের ছুভাগে কিছু বিশ্রামের ক্ষণ, আবার চলার আগে। আর শেষের ভাগটির অন্তে তো অনন্ত বিশ্রাম, পাষাণপুরীর কোকিলনয়ন সরোবর, সন্ধ্যা। তাই ভাবনা নেই সেই বিন্দুটি নিয়ে।

মাঝখানের ছুটিতে যে-ক্ষণ কাটাতে হবে, তার জন্যে কী দরকার না-দরকার, এই নিয়েই এলোমেলো চিন্তা চলছে, যখন পাশে ব'সে প্রিয়া উৎসুক, পা বাড়াতে প্রস্তুত—তবু পথ শুরুই হল না।

ঘরে কাঁপছে যথারীতি রাত্রি-দিন, আলো-অন্ধকার, হিজিবিজি রেখা দেয়ালে-দেয়ালে, কোথাও বা স্বপ্ন-সাধের সৌধ-মিনার। আশা-হতাশার বিদ্যুৎও ঝিলিক মারে হঠাৎ-হঠাৎ, বাজ পড়ে কান-ফাটানো শব্দে।

৩

ওর কিন্তু তন্ময়তায় লেশমাত্র চ্যুতি নেই, ধ্যানের চোখে নিয়ে পথ, চুপচাপ ব'সে আছে। ভেবেই
চলেছে, প্রথম দাঁড়িটায় কতক্ষণ বসবে, দ্বিতীয় দাঁড়িতে কতক্ষণ। আর গন্তব্যে পৌঁছেই যে-অসীম
শান্তির নিশ্চিত আলিঙ্গন, তার রেশ তুলতে চাইছে না মনে—এখনো না। এ এক অন্য শান্তি,
অন্য বিক্ষোভ, যার রাজত্ব চলছে এই গুমট নীরবতায়। প্রিয়া তার পাচ্ছে কি পাচ্ছে না আভাস,
সে জানে না, জানতে চায়ও না।

আর পথটা স্বয়ং, তার কথাও কি ভাবছে সে, একেবারেই? সেখানে কোথাও যদি হঠাৎ ধুলোর
ঝড় ওঠে, বা আকাশ ঘনিয়ে আসে বর্ষার কালো চুলে, তখন ছুটবে কোথায় মাথাটা বাঁচাতে?
বা যদি কোথাও পাশের পাহাড় প্রতিধ্বনি তোলে দানবের হুংকারের, গুল্মের শীর্ষে-শীর্ষে
হিশহিশ করে সর্প, সেসব সংকটে আত্মরক্ষার কী অস্ত্র নিচ্ছে সঙ্গে?

না, পথটা যেন কোনো কথাই নয়, মাঝের দাঁড়ি ছুটিই চরম। যেন সাপ বা দানব, বর্ষা
বা ধুলোর ঝড়, কিছু থাক বা না থাক সেখানে, পথটা পেরোবেই, যেহেতু আছে পথ
পেরোবারই জন্যে। এবং যেই বাড়িয়েছে পা, পেরিয়ে সে যাবেও।

তবু পা বাড়ানো চলছে না, তাকে আটকে রেখেছে মাঝখানের বিশ্রামের দাঁড়ি ছুটি।

আসলে গোটা পথটা রয়েছে এই ঘরেই—দানব রয়েছে, বর্ষা রয়েছে। যে-প্রিয়া গুঁটিসুঁটি ব'সে,
সরোবরের তীরে পৌঁছোলে তার উদার উন্মুক্ত উরু, তাও এখনই রয়েছে, সেইভাবেই। এরা সকলেই
ছিল এখানে, রাত্রি-দিন ধ'রে—পরেও থাকবে, তা প্রিয়াকে নিয়ে ও বেরোক
বা না বেরোক পথে।

দাঁড়ি ছুটিও ছিল, থাকবে। অন্ধকার খেলা করবে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, আশা-হতাশার বিদ্যুৎ
ঝিলিক মারবে।

সেটা জানে ও, নিশ্চয় জানে—তাই খেলাতেই মত্ত, এখনো কোনো সিদ্ধান্তেই
পৌঁছোচ্ছে না, ইচ্ছে ক'রে না। প্রিয়াও হয়তো জানে, বা জানে না—তবু তার
পা ছুটো ছটফট করছে, সে বেরোতে চায়।

হুংকার আছড়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে—ঘর হয়ে পথ, শেষের
কোকিলনয়নকে টেনে আনে কোনায়-কোনায়। তিন ভাগ এই মেঝে, একটি বিশ্ব।
দেয়ালে-দেয়ালে আকাশ, আকাশের গায়ে স্বপ্নের সৌধ-মিনার।

আহাম্মকের প্রশ্ন

ভোরে উঠে, হয়তো তখনো ঘুম নিয়ে চোখে, যারা দেখেছিল জানালার ওপারে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে
দেবদারু-অরণ্যের ফাঁকে-ফাঁকে দেবীর দৃষ্টিতে স্নাত গোলাপি বাড়ি-ঘর-দোর, দেখেছিল পূর্ণ প্রাণ এক,
পাখির হালকা শরীর নিয়ে উড়ে বেড়ায় শূন্যে ডানা মেলে, তারা হারিয়ে ফেলেছে সেই ছবি।

কারণ, বিছানা ছেড়ে উঠতে না উঠতেই, রাত্রির দূত ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের নাসারন্ধ্রে-বগলে-হাঁটুতে,
নিয়ে গেল তাদের আরো একবার পাষাণপুরীর কারাগারে।

শুধু বাইরে যে-হুহু হাওয়ার হুংকার চলে, তার শব্দই শুনল—এখনো শুনছে।

কত বেলা এখন, নাকি আবার সন্ধ্যা নেমেছে, কে বলবে? ওরা কেউ ব'সে, কেউ বা দাঁড়িয়ে, কেউ
বা পায়চারি করছে এক দেয়াল হতে আরেক দেয়ালে। কেবল দানব জেগে রয়, তার অস্তিত্বের
ঘোষণায় বাইরের পৃথিবী কাঁপে। কাঁপে এই অন্ধকারে তাদেরও বুক।

কেউ কথা বলছে না কারুর সঙ্গে, শুধু স্বপ্নের একটি ছিন্ন তন্তুও হঠাৎ উড়তে পারে কিনা, সেই
প্রতীক্ষায় মশগুল প্রতিটি ক্ষণ।

আর, এক ভীষণ ভার এই রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, হাত-পা নাড়ানো দায়—বিশমনী পাথর ঝুলছে গলা হতে।

যা হারিয়ে গেছে, তা কি আছে কোথাও, নাকি কোনোকালেই ছিল না—দেবী নেই, দেবীর
দৃষ্টি নেই, পাহাড় নেই, পাহাড়ের গায়ে অরণ্য নেই—এইসব প্রশ্ন ও চিন্তা বাদুড়-ঝোলার
মতো ঝুলে আছে কড়িকাঠ হতে।

বাইরে শুধু হাওয়ার হুংকারই চলে, চ'লেই চলেছে—তাই বন্ধ দশা হয়তো ভালোই।
হয়তো পাষাণপুরীর চত্বরেও যদি বেরোতে পারত, পায়চারিটা চলত না।

এ-শিকল উন্মুক্ত হবে কবে? ঝড় কি থামবে কখনো? তাদের অনুচ্চারিত সন্দেহগুলি
ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে, ফিরে আসছে তাদেরি মুখের উপর আগুন নিশ্বাসে।

সব প্রার্থনা স্তব্ধ তাই, মন্দিরের ঘণ্টা থামিয়ে দেওয়া হয়েছে দূরে-দূরান্তরে। প্রেমিক-প্রেমিকা
যারা ছিল, এখনো রয়েছে এই ঘরে, তাদের কামনার নিশ্চিহ্ন লুপ্তিতে গমগম করে ক্ষণ।

দেবদারুর অরণ্য জাগতে পারত এই দেয়ালেও, ফুটিয়ে তোলানো যেত সূর্যোদয়কেও, বা
দিগন্ত-রেখায় মিনার-গম্বুজও, তবুও কোনো সাধই মাথা তুলছে না—রাত্রির দূত
তাদের জাপটে ধ'রে ব'সে আছে।

আলোর অক্ষরে-অক্ষরে গাঁথা মুক্তার হার, তা এখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর স্মৃতি। তবু এখনো সম্পূর্ণ ভোলে নি কেউ, যেন দেখেছিল কিছু একটা, দেখেছিল-দেখেছিল— হয়তো ঘুম নিয়েই চোখে, বা সত্যিকারেরই কোনো দেখায়।

নিবু-নিবু বহ্নি সে, কোনায়, অদৃশ্যে, তবু এখনো সম্পূর্ণ নেভে নি। রাত্রির দূতদের এত দাপাদাপি হয়তো সেই কারণেই—হওয়ার হুংকার ছেড়েছে শুধু কারারুদ্ধদের আটকে রাখতেই নয়, পারে তো ওদের স্মৃতিটাকেও টুকরো-টুকরো ক'রে উড়িয়ে দিতে ঝড়ে।

পারবে কি ?

আরে! কোন্ আহাম্মক প্রশ্ন তুলছে? ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সময় কি এসে গেছে?

চিরকেলে পাপী

এবার যে পালিয়ে যায়, অনন্ত হাওয়ায়, এ-ঘরে তার বহু ঋণ শোধ করার ছিল। বহু মৃতদের ফিরিয়ে দেওয়ার ছিল প্রাণ, স্তব্ধতাকে কথা, কোনার ধুলো ঝেড়ে-মুছে বসানোর ছিল ফুলের ঝাড়।

অন্য আরেক কেউ যদি আসে ঘরে, যখনই আসুক, অন্তত তার কথাটাও ভেবে একবার।

পলাতক এখানে ক'রে গেছে অত্যাচার, যেখানে চোখ ছিল, তাকে উপড়ে নিয়েছে সে। ভেঙে-চুরে খান খান করেছে দেয়ালের শোভা সৌধ-মিনার—মেঝে ভর্তি কাঁচের কুচি এখন। শয্যার বালিশটাও কী তছনছ হয়ে প'ড়ে আছে, কাতরে-কাঁদা শিশু।

জানলা খুলে সে দেখেছে প্রভাতী আলো, দূর গগনে শুনেছে ভেরী। অমনি বিছায় কামড়েছে তার হাঁটু, পায়ের চেটো। অনেক অবশতার পর মাংসপেশীতে রক্ত নেচে উঠেছে।

বরফ ভেঙেছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, নদী ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় উন্মাদিনী। যোজন-যোজন পথ নিমেষে অতিক্রম ক'রে পৌঁছে যেতে চায় তরাইয়ে, তরাই হতে সমতলের বিরাট উপত্যকায়।

দেখবে জনপদ, দুধারে বাড়ি-ঘর-দোর, ছেলেমেয়ের খেলা আঙিনায়।

তবু তার আগে, ঋণশোধের অন্ত ছিল না তার এই ঘরে।

দ্যাখো-দ্যাখো, কী ভীষণ চমকে উঠছে লোকটা, ভয়ে হাত-পা সেঁদিয়ে আসছে পেটে, যেই ভাবছে এই বুঝি ঘরের অনেক আলিঙ্গন আবার ছুটে আসে আক্রমণ করতে, তাকে নিয়ে চ'লে যায় ঐ শয্যায়—যেখানে তারই প্রিয়াকে, রাত্রির গুমট প্রহর ধরে, সে কোপের পর কোপ মেরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে।

গলা টিপে দম বন্ধ করেছে সে তার, যোনির অরণ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রিয়ার চোখের কিছু অংশ ঐ ভাসে এখনো দেয়ালে, ঠোঁটের আর্তনাদ হয়তো এখনো প্রতিধ্বনি তোলে কড়িকাঠে।

তবু ভাগ্যিস, ভয় আসে ও যায় সকল কিছুরই মতো।

বিছায় কামড়াল আবার তাকে, কোন্ এক অন্য নারীকে সে দেখল গোলাপি আলোয়। মিলনের নতুন অভিনিবেশে আকুল হল তার শিশ্ন।

তবে, এ তো আর সেই ছোটো ঘরটি নয়, নয় বেড়ার মধ্যে বিধৃত সংসার—এবার যে অন্তহীন হাওয়া, পথের পরে পথ, আকাশ মিশে গেছে আকাশে-আকাশে।

অত্যাচারীর স্বভাব বদলায় না, চিরকেলে পাপী হঠাৎ সাধু-সন্ত ব'নে যায় কী ক'রে? নাকে তিলক যতই কাটুক, যতই গেরুয়া পরুক!

কী অত্যাচার করবে সেখানে ও এবার? কত শক্তি থাকবে ওর মাংসপেশীতে? নাকি নিঃশেষিত হবে অচিরেই, এবং সেটা একবার হলেই, ঐ তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আকাশ-হাওয়া, আকুল শিশ্ন তার কেটে-কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে ছড়িয়ে-ভাসিয়ে দেবে আলোর স্রোতে? দিকদিগন্ত দুচোখ ভ'রে দেখবে অত্যাচারীর শাস্তি?

এসব ভাবনায় ও একেবারেই বিব্রত নয়। অন্তত এখনো নয়। ভেরীটা শুনেছে।

ঋণ শোধ না ক'রেই চলল।

রথ

চোখে ধুলো দেওয়ারই সময় চলছে। জামাকাপড়ের অস্তিত্ব নেই, অথবা যা আছে, তা ছিল না কিছুক্ষণ আগে, থাকবে না কিছুক্ষণ পরে। শব্দমালা হুড়হুড় নদী, এত খরস্রোতা যে বনানী জাগতে না জাগতেই, তার নাম দিতে চাইতেই, মরু এসে হাজির।

আবার নাম দিতে চাওয়া, চোখে তাকানোর চেষ্টা, শনাক্ত করার অভিপ্রায়, তার, যে এসব আনছে। এবং ওদেরও, যারা এসে হাজির হচ্ছে, কারণ তারাও তো চায়, নিজের নামের তকমাটা গায়ে এঁটে, নিজেরই জামাকাপড়ে, একটুক্ষণ বসুক, নিজেকে দেখুক, দেখাক।

চোখে ধুলো দেওয়ারই সময়, দিনে-রাত্রে, সকালে-সন্ধ্যায়। ধুলো এ দেয় ওর চোখে, ও দেয় এর চোখে।

ঘরের আদি অধিবাসী কারা? ঐ কোণে প্রথমে কে ছিল? কী ছিল দেয়ালে? এখন সূর্যাস্তের ছটা এদিকে-ওদিকে, যা পরমুহূর্তেই হয়তো, সব ঘড়ির কাঁটাকে ছুয়ো দিয়ে, নিয়মের রাজত্ব বন্যায় ভাসিয়ে, পরিণত হবে দুপুরে।

আমি একটা পিশাচ, ওরাও কম দৈত্য-দানব নয়। ওরা আমার দম বন্ধ ক'রে আনে, আমিও ওদের গলা টিপে মারছি।

এ-যুদ্ধ চলবে কতক্ষণ? কখন নামবে শান্তি রণক্ষেত্রে? কেমন শান্তিই বা হবে তা? সঙ্গীতে গুঞ্জরিত কুটীরের, না ধড়হীন মুণ্ড ও মুণ্ডহীন ধড়ের ছড়াছড়িতে রক্তাক্ত প্রান্তরের? যে-বাঁশি হয়তো একটু বেজেছিল, তার ঘুমড়ানো অংশ কোনোখানে— যে-প্রিয়া হয়তো একবার হেসেছিল, অসিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ তার ঠোঁটের একোণ-ওকোণ ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত উত্তরে-দক্ষিণে।

শ্মশান স্বপ্নের, সাধের, হাহাকারের—হাওয়াহীন স্তব্ধতার। আর কর্তা যে এইসব কীর্তির, সে নিজেই চূড়ান্ত শব—কে খুঁজবে সেই তছনছে কোথায় প'ড়ে আছে তার ভগ্ন উরু, কোথায় তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অণ্ডকোষ, তার জরাজির দুয়েকটি কেশ?

আপাতত এসব প্রশ্ন অবশ্য কারুরই নেই। নদী ছুটছে হু-হু ক'রে, নিসর্গ বদল হয়েই চলেছে। তোমার কী নাম, আমার কী নাম, সেটা জিজ্ঞেস করারও ফুরসত নেই। রথ যে চালিয়েছিল, এখন সে নিজেই চালিত, তারই রথের দ্বারা। দিক বেঁধে দেবে কে, সারথি, না রথ?

অতএব, এ-ধূসর দৃষ্টির ক্ষণে, আমরা কেউ কাউকে জানি না—আমি নেই, তুমি নেই, যেটা আছে সেটা নেই। ঝড় ব'য়ে চলেছে সকলেরই উপর দিয়ে।

প্রশ্ন নিয়ে, সাজিতে ফুল সাজিয়ে, দূর-দূর গ্রাম হতে যারা হয়তো এসেছিল, হয়তো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের বাইরে—তারা দাঁড়িয়েই থাকবে।

রথ যখন থামবে, যদি থামেই কখনো, তখন কে জানে কোন্ পরিচয় দেওয়া-নেওয়ার সময় হয়তো আসবে, বা হয়তো আসবে না।

যখন পুতুল হল প্রতিমা

কোনো হাওয়া নেই, তবু মেঝে হতে হঠাৎ উঠল ঝরা পাতা, নাচতে থাকল শূন্যে-শূন্যে। যেন বৃদ্ধের, অথর্বের, কুঁকড়ে-যাওয়া শিরা, হল সবুজ সঞ্জীবনী নদী—শোভন মানচিত্র এক তরুণ হাতের, সরস, সুন্দর। পরে, শীতের শ্মশানের অবসান ঘটিয়ে জাগল অরণ্যানী, ডালে-ডালে তুলে ঐ পাতাদেরই, যারা হঠাৎ যেন পাখি, ডানায় ভর ক'রে উড়ল পুড়ুত-পুড়ুত। এখন কচি, ঘনশ্যাম, শাখায়-শাখায় ঠিক-ঠিক জায়গা বেছে নিয়ে রৌদ্রে ঝলমল, প্রাণের উৎসবে আত্মহারা।

পুতুল হল প্রতিমা।

আর তখনই, লোকটার হুঁশ ফিরে এল। সচকিত, শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল, রঙ পালটে যাচ্ছে দেয়ালে-দেয়ালে, কোলের কাছে কী এক পৃথিবী এসে হাজির। কাদের নিশ্বাস পড়ে মুখে, কারা ফিশফাশ করে কোনায়-কোনায়।

এক অবশতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে শরীর, চন্দনের মতো মৃদু মন্দ গন্ধ আসছে নাসারন্ধ্রে—ভালো লাগারই কথা, ভালো হয়তো লাগছেও। তবু তার মনে হল, সে যেন কবলে পড়ছে কার—তাই ফিরে পেতে চাইল আগের ঝরা পাতা। যে-ধুলা ছিল কোনায়-কোনায়, এখন আর নেই, তাকে দেখতে চাইল আবার। সে ফিরে পেতে চাইল, প্রতিমার বদলে পুতুল।

যেই-না চেয়েছে সে তা, প্রতিমা হল রাক্ষসী, ক্রমশই রক্তনয়না। যেতে তোমায় দেব না, দেব না, এই শাসন ধ্বনিত-ঝংকৃত হল সেই নারীর উদ্ধত স্তনবৃন্তে। ব্যাঘ্র ডেকে উঠল অরণ্যে।

দুয়ার বন্ধ, পালাবার পথ নেই, ওঠারও শক্তি নেই। ইতিমধ্যেই এত বদলে গেছে ঘর, এত নতুনের ভিড়—এত অপরিচয়, এত জুলুম। সহস্র চোখ চেয়ে আছে তার কপালে-নাকে, তাকে গিলে খাচ্ছে। আলোর রশ্মিতে গা-হাত-পা পুড়ে যায়।

তবে হয়তো ঝলসে যেতেই হবে এবার, এই আগুন লাগল ব'লে। একটি বহ্নি, এক মুহূর্তে, যে-কোনো কোথাও, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে হবে ভস্মীভূত—ঝরা পাতারও অধম।

এ-মৃত্যু সে চায় নি, চেয়েছিল জীবন, তাই মন্ত্র পড়েছিল পুতুল ছুঁয়ে। এবার বন্দী নিজেরই খাঁচায়, হয়তো নিজেই জ্বালাল আগুন।

অগ্নিকাণ্ডের এই পূর্ব মুহূর্তে, প্রার্থনার সাধও যখন আর নেই, দরজার বাইরে প'ড়ে আছে পথ। হয়তো একই সেই পথ যা আগেও ছিল, যা তাকে নিয়ে আসে ঘরে—যা হয়তো পরেও থাকবে, আশেপাশে নিয়ে পরিচিত দোকানপত্র সরাইখানা, পাষাণপুরীতে মিনারের ধ্বংসাবশেষ। হাওয়া বয় হু-হু ক'রে, মেঘে-মেঘে গর্জন।

কেবল এখানেই, আগের কিছু আর নেই—সব ইতিহাস মুছে গেছে। গোটা একটা অন্য গ্রহ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে দশ-বারো হাতের এই ক্ষুদ্র চৌহদ্দিতে। সীমানাটা হাতে-হাতে মাপতেও যদি চায়, সে-হাত তো এখন অনড়, স্থাপত্যবিশেষ।

ভয়ের অজগর জাপটে ধরেছে তার সর্বাঙ্গ।

হুঁশ ফিরে এল তার—কেন এল ?

পুতুল হল প্রতিমা, পরে হল রাক্ষসী।

এক টুকরো চিঠি

আবুল বাশার

এক

আমার কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ভ্যানিটির মধ্যে এক টুকরো চিঠি আছে খুব মারাত্মক। আমার মা লিখেছেন তাঁর মাসির মেয়ে শিরিনকে। শিরিন আমার মায়ের সতীন ছিলেন। আমার বাবা প্রাক্তন মুসলিম লীগ এম. এল. এ.। শিরিন তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষ ছিলেন। মাসি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। আমাদের খুব বন্ধুত্ব ছিল। মা শিরিনমাসিকে স্নেহ করতেন। শিরিন-মাসির পড়াশুনোয় যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। স্কুল ফাই-নাল পাশ করার পর বাবার সাথে বিয়ে হয়েছিল। ওই অব্দিই পড়াশুনোর ইতি। শিরিনমাসি মায়ের চেয়ে সুন্দরী। বোধহয় আমিও তাঁর মতন সুন্দরী নই। বাবা সেই রূপেই মুগ্ধ হয়ে শিরিনকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর পাঁচ বছর যেতে না যেতে বাবার সাথে মাসির বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কেন যে বিচ্ছেদ হয়েছিল, সে-এক অতর্কিত বিস্ময়।

আমি তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। পুজোর ছুটির পর অ্যানুয়াল পরীক্ষা। রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয়। শিরিন অঙ্কে এত ভালো ছিলেন যে মনে হত মহিলা যেন-বা অঙ্কের জাহাজ। উনি বলতেন, অঙ্কের জন্য মেধার খবরদারি লাগে না, চাই অভ্যাস। যদিও হায়ার ম্যাথমেটিক্স্ ইজ নট এভরিবডিজ কাপ অব টী। তথাপি প্র্যাকটিস চালিয়ে গেলে খোদাও ফেল করাতে পারে না। ইউ মাস্ট অবটেইন অ্যাট লীস্ট এইটি পারসেন্ট্ ইন এরিথমেটিকস। আই অ্যাম এ "শিওর সাকসেস" ইন ইওর হ্যানড। বাট আই অ্যাম নট ইওর টীচার। আই অ্যাম এ পুওর গার্ল, ফুল অব কনট্রাডিকশনস, মাই পয়েনট ইজ জিরো, রেজালট ইজ জিরো, মাই আনসার ইজ নীল। এই ধারায় ইংরাজি বলা তাঁর অভ্যাস ছিল।

বলতে-বলতে শিরিন কেঁদে ফেলতেন। আমি কাঁচা অঙ্কের ছাত্রী, পরীক্ষায় সে বছর ৮২ নমবর পেয়ে থার্ড হয়েছিলাম। আজ ইলেভেন ক্লাশে আর্টস-এর

ছাত্রী উইমেনস কলেজে। আই অ্যাডমিট, আই নো, হায়ার ম্যাথমেটিকস নট ইজ এভরিবডিজ কাপ অব টী। কিন্তু শিরিনের কাছে অঙ্ক ছিল এক গেলাস মিছরির শরবত। হায়! অথচ শিরিনের বিদ্যের দৌড় কলেজ অব্দি পৌঁছতে পারে নি। আমার বাবাই ছিলেন তাঁর হায়ার ম্যাথমেটিকসের শেষ মাইলস্টোন, তার সংখ্যা ছিল জিরো। এবং মজাটা এই, অঙ্কের রাজত্বে জিরোরও নাকি একটা অদ্ভুত মানে আছে। শিরিনমাসি সেই স্টোন অতিক্রম করে কোথায় পৌঁছেছেন, আমি তার সামান্য জরিপ করেছি। বাকি রহস্য এই চিঠির আড়ালে লুকিয়ে। সেটাই এই গল্পের ভবিষ্যৎ। তার রেজালট আমার জানা নেই। যাই হোক। মাসি বলতেন, তাঁর জীবনটা, তাঁর লাইফ, ফুল অব অ্যাডভারসিটিজ অ্যানড ফুল অব কনট্রাডিকশনস। একটা উলোটপালট আবর্ত। তখন সবখানি বোঝার সাধ্য ছিল না। ক্লাশ নাইনে পড়ি। বয়স মানুষকে কিছু অঙ্ক শেখায়। আমি তখন অঙ্কের আসল ভ্রান্তি এবং নকল সাফল্য বুঝতাম না। শিরিনের দুঃখ পয়েনট-বোর্ডে কতদূর উঠেছিল জানা নেই। শুধু সেই বিচ্ছেদের ধোঁয়াশা-লিপ্ত রাত্রিকে মনে পড়ে। মাসি যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে এলেন। সেই এক নারীর রক্ত-ফোঁসানো রাত্রি আজ মনের তলে কুণ্ডলী পাকায়। সামুদ্রিক জলকম্পনের দীর্ঘনিশ্বাস লাগে। সেদিন মানব-মানবীর বিচ্ছেদের একটা ক্রুর আকৃতি দেখতে পেয়েছিলাম। তার একটা ভিজুয়াল এফেকট হয়েছিল আমার মধ্যে। একজন কিশোরীর বুকের কুঁড়ি যৌবনের ভারি বুকের জগদ্দল-বন্দী হয়ে হয়তো হাঁসফাঁস করে উঠেছিল। ঘুমজড়ানো চোখে বিছানায় ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছি। কে যেন বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। দোতলার বারান্দায় বাবা মধ্যরাত্রির নামাজ পড়ছেন জোরে-জোরে। তাঁর কণ্ঠে কেমন একটা বিরক্তি আর ঈষৎ উদ্বেগ মেশানো। নামাজের মধ্য দিয়ে তিনি কোথায় যেন পালিয়ে যেতে চাইছেন। সেতারের এলানো তারে কে যেন বেসুরো আঘাত করে যাচ্ছে। সেই সুর কালো আকাশের গড়ানে নেমে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ-ভাঙা ঘুমের জড়িমায় বাস্তব তখন অস্পষ্ট।

দুই

শিরিনমাসি বিয়ের এক বছরের মাথায় হঠাৎ একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। ধূপ-ঘন সন্ধ্যার অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে দড়ি হাতে করে একাকী গিয়েছিলেন সিঁদুরে আমগাছের কাছে। ডালে লটকে ঝুলছিলেন তিনি। পা দুখানি আলতা-লিপ্ত এবং ঝুলন্ত ছিল, বাবার হাতের টরচের আলোয় সাদা ধবধপে পা আমিও দেখেছি। শিরিনের গোঁঙানি শুনে (প্রথমে বুঝি নি সে অমন করে গোঁঙাচ্ছে এবং কোন্‌দিকে ডাকছে) আমরা সবাই দৌড়ে গিয়েছিলাম বাগানের মধ্যে, বাবার হাতের জোরালো টরচ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। গাছ থেকে নামিয়ে মাসিকে যখন শোয়ানো হল খাটের ওপর, মাসির গলায় নীল শিরা তখনও দপদপ করছে। কিছুক্ষণ প্রায় সংজ্ঞাহীন মাসি। পরে সহসা কী এক বিদঘুটে গলায় প্রেতাত্মার মতন কাঁদলেন। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। মাসির মুখে ফেনা উপচে পড়ছিল। মাসি কেন ওইভাবে দড়ি হাতে ছুটে গেলেন, আজও ভাবি। শিরিনের পেটে তখন বাচ্চা এসেছে। গায়ে তাঁর ভরন্ত সুষমা, চোখে টলটলে মাতৃত্ব। সেই দিনই কি মাসির পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়? বাচ্চা ম্যাচিওর্ড হতে পারেনি। অপুষ্ট মৃত মাংসপিণ্ড প্রসব করেছিলেন মাসি। আমরা ভাবতেই পারি নি, মাসি এইরকম কাজ করতে পারেন। মায়ের সাথে ছোটোবোন শিরিনের কোনো বিরোধ ছিল বলে মনে হয় নি। মা তাঁকে বোনের মতন দেখতেন, সতীন ভাবতেন না। তবু কেন মাসি ওইভাবে দুম করে মরতে চেয়েছিলেন? শিরিনের মুখে কখনও পাপের চিহ্ন দেখি নি। তা ছাড়া ওঁকে সবসময় হাসি-

খুশিই দেখেছি। দুঃখের কথাটাও উনি হাসতে-হাসতে বলতেন। এমনকি হাসতে-হাসতে কেঁদে ফেলতেন। সেই শিরিন অমন কাজ করতে চাইলেন কেন? মাসি আত্মহত্যায় ব্যর্থ হয়ে আগের চেয়ে আলাদা মানুষ হয়ে উঠলেন। ভীষণ শৌখিন ছিলেন তিনি। দামি সাবান, গন্ধতেল এবং বিদেশি সেন্ট্ ব্যবহার করতেন। সেইসব গন্ধিল পারফিউমের মিশ্রিত গন্ধ ছিল বড়োই উতল। এমনকি আত্মহত্যার সেই সন্ধ্যায় তাঁর গায়ে সেইসব গন্ধ লেগে ছিল। গন্ধটা এখনও নাকে লেগে আছে। সেই দুর্ঘটনার পর মাসি অন্যরকম হয়ে গেলেন। জানালা খুলে সেই সিঁদুরে গাছটার দিকে চেয়ে থাকতেন। কথা বলতেন খুবই কম। আমি জানালা বন্ধ করে তাঁকে ঘরের খাটে টেনে এনে বসাতাম। বলতাম—অমন করে চেয়ে থাক কেন? তুমি কি মৃত্যুর কথা ভাব? কেন তুমি মরবে? আমরা তো রয়েছি। তোমার কষ্টের কথা আমায় বলতে পার না?

উনি বলতেন—তুমি সব কথা বুঝবে না, মিনু!

শুধাতাম—কেন বুঝব না?

মাসি কোনো উত্তর না করে নিঃশব্দ হেসে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু আমি তাঁকে বন্ধুর মতো মনে করতাম। সেই দুর্ঘটনা উনি ভুলতে চাইতেন। আমরাও চাইতাম, উনি ভুলে গিয়ে সুস্থ হয়ে উঠুন। কিন্তু ওই সিঁদুরে গাছ, সেই গাছের মালিক, ঘটনাকে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে চললেন। বাগানের মালিক ছিলেন এক হিন্দু প্রতিবেশী, আমার চাচাদের ভাগে ছিল ওই বাগান। এখান থেকে তাঁরা অন্যত্র উঠে গিয়ে দালান করেছেন। যাবার সময় বাগান বিক্রি করে গেছেন। কিনেছেন গোলোক সমাজদার। চাচারা বাবার ওপর হিংসে করে বাগান গোলোকবাবুদের দিয়ে গেছেন। গোলোকবাবুর সাধের সিঁদুরে গাছে ওই দুর্ঘটনার পর কী এক দুর্জ্ঞেয় কারণে বউল আসা বন্ধ হয়ে গেল। মুকুল ধরে না। গুটি হয় না। পর-পর দুই বছর এইরকম হল। ধীরে-ধীরে কথা উঠল—গাছে শাপ লেগেছে। অপয়া বউ পেটের বাচ্চা মেরেছে। গাছকে করেছে বন্ধ্যা। গাছ ভয় পেয়ে বোল দিচ্ছে না। কথাটা নানারকম গলায় নানান সুরে খেলিয়ে-খেলিয়ে বলা হতে থাকল। বেশির ভাগ সময় গোলোকবাবুর স্ত্রী পাশের বাড়ি থেকে ওই কথা পাচার করতেন, গলা বাজিয়ে শিরিনকে অভিসম্পাত দিতেন। বলতেন—আমাদের কেষ্টপুরের বাগানে একবার কাঁঠাল চুরি হল। সোনামুখী গাছ গো। সে কি কাঁঠাল! কোয়া দেখে চোখ ধরে যায়। জোঁয়ালের সমান সাইজ। চুরি করল এক মুসলমান ছিঁচকে, নফর শাহ্ নাম। শালা ছুঁচকি চোর। অমাবস্যায় চুরি তো। গাছ ডরিয়ে গেল। আর ফল দিলে না। ওইভাবে চুরি হলে গাছের সতীত্ব চলে যায়। গাছেরও তো প্রাণ আছে। মান অভিমান আছে। আমার সিঁদুরি গাছটার সেই হাল করল ওই অপয়া মেয়ে। গাছের বুকে ডর ধরিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে দোষারোপ চলত। নানাসুরে কথা পল্লবিত হত। বউল আসার সময় হলে বাগানের পরিচর্যার বহর বেড়ে যেত। গোলোকবাবু নল উঁচিয়ে পাম্প মেশিনে ওষুধ স্প্রে করতেন বউলের পুঞ্জে-পুঞ্জে। সিঁদুরি গাছের কাছে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। মাসি জানালা খুলে সেই দৃশ্য দেখতেন। একবার গাছের তলায় ঘট প্রতিষ্ঠা করে তেলসিঁদুর-পাতাপল্লব দিয়ে পূজা দেয়া হল। ঢাক বাজানো হল। মন্ত্র পড়ে মুসলমানের গাছের হিন্দুত্বপ্রাপ্তি ঘটানো হল। বাবা সেইসব দেখে খেপে উঠলেন। গাছ বিক্রি হয়ে গেল বটে, কিন্তু গাছের চারা তাঁর বাপের হাতে লাগানো। তিনি সহ্য করতে পারলেন না। দাদাজী বেঁচে থাকলে কষ্ট পেতেন ভেবে বাবা কষ্ট পেতে থাকলেন। একদিন গোলোকবাবুর সাথে ওই নিয়ে বিবাদ হয়ে গেল। গোলোকবাবু তলে-তলে নিখিলবিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য হয়েছেন। মা দুঃখ পেয়ে বাবাকে বললেন—ওদের গাছ ওরা যা খুশি করুক, তুমি ঝগড়া করছ কেন?…বাবা রেগে গিয়ে

বললেন—ওদের গাছ ? কে বলেছে ওদের গাছ ? আব্বাজী নিজে হাতে ওই গাছ বহাল করে গেছে। ওইরকম ঢোল বাজালে আব্বাজী কবরে শুয়েও শান্তি পাবে না। আব্বাজীর রুহ্ (আত্মা) কতখানি কষ্ট পায় তুমি জান ? মা বললেন—বউল ধরে না বলে ওরা ঢাক বাজায়। পুজো দেয়। আমরাই তো দোষ করেছি। শিরিন কেন ওই গাছে দড়ি দিতে গেল ?

বাবা-মায়ের তক্কাতক্কি আমি আর মাসি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। বাবা গরম গলায় বললেন—ওই মেয়েকে আমার তালাক দেয়া দরকার। ও আমার সন্তান খেয়েছে। হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে ওরই কারণে বিবাদ-বিসংবাদ হচ্ছে। আমি লীগ করি, হিন্দু রাষ্ট্র, দার-উল-হার্ব, এদেশ দার-উল-ইসলাম নয়। এখানে ধম্ম বাঁচে না। ওই শালা সমাজদার কতখানি সাংঘাতিক বামুন জান না তো ! পারে না যে গাছের গলায় পৈতে পরায়।

শিরিন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ফস করে জ্বলে উঠলেন।—আপনিই বা ওই গাছের মাথায় ইসলামি টুপি পরাতে চাইছেন কেন ?

বাবা বললেন—তুমি পাপ করেছ, তাই। লজ্জা করে না তোমার ? তোমার জন্যে এইসব, ফের কথা বলতে এসেছ !

শিরিন ধীরে-ধীরে অন্য ঘরে চলে গেলেন। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, সামান্য একটি গাছকে কেন্দ্র করে কী কুচ্ছিত সংস্কার বার-বার শিরিনকে আঘাত করে যাচ্ছিল। বাবা এই দেশকে কখনও নিজের দেশ মনে করেন নি। কথায়-কথায় বলতেন, এই দেশ বিধর্মীর দেশ। দার-উল-হার্ব। এদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। বিধর্মীদের, কমিউনিস্টদের শাসন জারি হয়েছে। ফতোয়া-ই-আলমগীরিতে রয়েছে, দেশে যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না, বিধর্মীর শাসন জারি হয়, আদালত ইসলামকে অপমান করে, নাস্তিক মার্কস সাহেবের পূজা করে মানুষ, তখন দেশ দার-উল-হার্ব নয় তো কী ? তাই বাধ্য হয়ে উনি জামাত-ই-ইসলামকে পছন্দ করেন। মাঝে-মাঝে সংসার ছেড়ে জামাতে চলে যান। দেশে-দেশে ইসলামি জীবন-বেদ প্রচার করে বেড়ান। একটা বিরাট অংশের ইসলামি যুবশক্তি জোর কদমে এই প্রচার অভিযানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ইসলামি নবজাগরণ ঘটছে। এই দেশের বিধর্মী নেতাদের বিরোধিতার কারণে একদিন ওহাবী আন্দোলন মার খেয়েছে।

এই বিষয়ে তক্ক করতে ভালোবাসেন বাবা। সাদিকুল সাহেব আসেন বাবার কাছে। মার্কসের ভক্ত। রাজনীতি করেন। চাকরি পান নি বলে শহরে একটা টিউটোরিয়াল হোম খুলেছেন। উনি এলে বাবার সাথে 'বাহাস' হয়। বাবা বোধহয় সাদিকুলকে সহ্য করতে পারেন না। মায়ের দিক থেকে উনি আমাদের অতি দূর সম্পর্কে আত্মীয়। আমি মামা বলি। আমার ভাইবোনদের উনি আদর করেন। একমাত্র উনিই শিরিনের সাথে গল্প করার জন্য অন্দরে ঢুকে পড়তে পারেন। মায়ের সাথে নানান কথা বলেন। চা খান। কখনও-বা বাবাকে নিয়ে আমাদের সামনে টিপপনি করেন। বাবা সাদিককে আমল করেন না। বাবারও ধারণা, ছেলেটি ভালো। তবে বিভ্রান্ত। এই দেশের আসল বিপাক কোথায় ধরতে পারে না। বেকুফ। ভ্যাগাবনড।

সাদিক একদিন গাছের প্রসঙ্গ শুনে হেসেই আকুল। খানিক চড়া গলায় হেসে হাসি নিভিয়ে ফেললেন, ওটাই ওঁর স্বভাব। তারপর বললেন—তবে শোনো……

তিন

'তবে শোনো' বলা মানেই ধরতে হবে, উনি এবার খুব মজা করে গল্প শুরু করবেন। সবাই উৎসুক হয়ে উঠলাম, আমি চট করে একটা বুদ্ধি করলাম, বললাম—এক মিনিট। শিরিন-খালামাকে ডেকে নিয়ে আসি। উনিও শুনবেন।

তড়াক করে খাট ছেড়ে নেমে পাশের ঘরে এলাম। দেখলাম, শিরিন জানালা ধরে বাগানের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন। ওইভাবে মাসিকে দেখলে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। হাত ধরে টেনে জানালার পাল্লা ঠেলে দিলাম, চেয়ে দেখি, শিরিনের চোখে জল টলটল করছে।

—এ কী, কাঁদছ ?

—না। কিছু না। তুমি আমায় ছেড়ে দাও। আমি ও-ঘরে যাব না। ওই লোকটির রগুড়ে কথা সব সময় ভালো লাগে না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম—মনকে যত খারাপ রাখবে, মন তত খারাপ থাকবে। আমাদের মধ্যে মামাই একমাত্র রঙিন মানুষ। ওঁকে তোমার ভালো লাগে না ?

—না। একদম না। এখন আমার একটাই রঙ পছন্দ। সিঁদুরি গাছ।

—বেশ তো। মামা তো গাছের কথাই বলতে চাইছেন। কী হল, যাবে না ?

শিরিন পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে এঘরে খাটের একপ্রান্তে বসলেন। শিরিনকে দেখে মামা বললেন সচকিত গলায়—ও ! আপনিও এসে পড়েছেন ? এবারে বুবুকে (মানে মাকে) ডেকে আনো, মিন্টু। বোটানিক্যাল গার্ডেনের দুটি গাছের গল্প আমি শোনাব। একটি হল ফুল। নাম হল লিলি। দুই হচ্ছে একটি হতভাগ্য খেজুর। যাও।

বললাম—মা আসবেন না। রান্নায় ব্যস্ত।

মামা বললেন—বেশ, তবে শুরু করি। কথা হল, গাছেরও প্রাণ আছে, বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন। গাছ অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। ওর হিংসা আছে। ভালোবাসা আছে। ঘৃণা করে গাছ। গাছ আহ্লাদিত হয়। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে সেবার গেলাম। গাইড একটা ডোবার সামনে এনে বললে—ওই যে দেখছেন পদ্মপাতার মতন বিশাল পাতা, ওটা পদ্ম নয়। ঐ ফুলও পদ্মফুল নয়। দেখতে পদ্মপাতার মতনই বটে। ওটা একজাতের লিলি। পদ্মার পাতা অতখানি প্রকাণ্ড হয় না। ওই পাতায় একটি এক-বছরের মেয়ে-বাচ্চা বসে থাকতে পারে। ডুববে না।*

প্রশ্ন করলাম—মেয়ে-বাচ্চা কেন ? ছেলে হলে কি ডুবে যাবে ?

গাইড বলল—অবশ্যই ডুববে।

—কেন ?

—সেটা বলতে পারব না। কারণ একটা আছে নিশ্চয়। তবে বোধহয়, লিলি মেয়েদের ভালোবাসে। পুরুষদের সহ্য করে না।

বলতে-বলতে গাইড এগিয়ে গেল। গাইডের কথা কেউ-বা বিশ্বাস করছিল, কেউ করছিল না। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমাদের মনোভাব টের পেয়ে গাইড নদীর ধারের একটি বটগাছের কাছে এনে বলল—দেখুন। গাছ কেমন হিংস্র হয়। ঝুরি দিয়ে খেজুরটাকে জড়িয়ে কেমন করে মেরে দিয়েছে। দেখি তাই, শূন্য খাঁ খাঁ করছে গাছ। মস্তকহীন নিষ্পত্র খেজুর। মরে গেছে। মৃত অবস্থায় বটের নিষ্পেষণে দাঁড়িয়ে কী করছে গাছ ? খেজুরের মাথায় একটা শকুন চুপচাপ বসে ঝিমোচ্ছে। দেখে, ভেতরটা চমকে যায়।

শুনতে শুনতে শিরিন দুহাতে মুখ ঢেকে শিউরে এক-ধারা আর্ত-অস্ফুট শব্দ করলেন। সেই শব্দ কান পেতে শুনে ম্লান হাসলেন সাদিক। তারপর বললেন—বিজ্ঞানীরা একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাতে গাছের হার্ট-বীট, পাল্স্-বীট ধরা পড়ে শুনেছি। শোনা কথা। এক বিজ্ঞানী ওই যন্ত্রে চেয়ে দেখে নাকি গাছের উল্লাস এবং বিষাদ অনুভব করতে পারেন। উনি গাছ ভালোবাসেন বলে গাছও তাঁকে ভালোবাসে। যেখানে তিনি গবেষণা করেন, সেখানে সেই যন্ত্রটা

* বোটানিক্যাল গার্ডেনের গাইডদের মুখে এই ধরনের জ্যান্ত উক্তি বাস্তবিক প্রচলিত। সেটা কি শুধুই গল্প ?

আছে। তার কাঁটা বিজ্ঞানীকে দেখতে পেলে কেঁপে ওঠে আহ্লাদে। সেই বাগানে কাঁচি হাতে মালি ঢুকলেই ঐ কাঁটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা স্টাডি করে বিজ্ঞানী বুঝলেন, গাছেরও খুশি-হওয়া, ভয়-পাওয়া বলে একটা ব্যাপার রয়েছে। অতএব শিরিন-কেও সিঁদুরি গাছটাকে খুশি করতে হবে। কথা শুনে শিরিন সাদিকের দিকে চোখ তুলে স্পষ্ট করে তাকালেন। মামাকে আমি আগেই মাসির মনের সব অবস্থা বলে দিয়েছিলাম। মামা বললেন—দেখুন, মেয়েদের শুধু মামাশ্বশুর-ভাগনেবউ (লাজুকলতা) হয়ে থাকলেই তো চলে না, মেয়েদের কিঞ্চিৎ লিলিও হতে হয়। সিঁদুরি গাছের কাছে গভীর রাতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলবেন, আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি তোমারই মতন অসহায়। আমি কখনও আত্মহত্যা করব না। আমি আখতার হাজীকে একটা সন্তান উপহার দেব। তুমি পুষ্পিত হও। বলতে-বলতে সাদিকুল উঠে দাঁড়ালেন, । শিরিন সাথে-সাথে বাধা দিয়ে বললেন—উঠছেন কেন? বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

শিরিন হঠাৎ যেন খুশি হয়ে উঠেছেন। খাট ছেড়ে নেমে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ছোটোরাও খেলতে চলে গেল। বিকাল হয়ে আসছে। চা খেতে-খেতে মামা আরো কিছু গভীর কথা তুললেন। বললেন—লিলির একটা প্রতীকমূল্য আছে মেয়েদের জীবনে। গাছের নিজস্ব কোনো সংস্কার নেই। ধর্ম যা তা-ও খুব প্রিমিটিভ। ক্ল্যান যুগেরও ওপারে পড়ে আছে বৃক্ষ লতাপাতা। কারণ ওরা মানুষের চেয়েও পুরনো প্রাণ। ওদের আমাদের মতন কোনো গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম কখনও ছিল না। আজও নেই। বুঝলে মিনু, একথা গোলোকবাবু কিংবা তোমার বাবা বুঝতে চাইবেন না। কেন বলো তো?

শুধালাম—কেন?

সাদিক বললেন—কারণ উনি মনে করেন শবে-কদরের রাতে বৃক্ষলতাপাতা আল্লাকে সিজদা (প্রণাম) করে। মোনাজাত (প্রার্থনা) করে। যাঁরা পরহেজগার (নৈষ্ঠিক পুণ্যাত্মা) তাঁরা গভীর রাতে স্বচক্ষে নাকি সেই নামাজপড়া দেখতে পান। তোমার বাবা হাজী আখতার এম. এল. এ. (মুসলিম লীগ) আমায় পরম বিশ্বাসের সাথে একথা বলেন। আমি সেকথার প্রতিবাদ করি নি কেন জান?

—কেন? প্রশ্ন করি।

মামা বলেন—কারণ মানুষ বরাবরই গাছপালার মধ্যে নিজের চৈতন্যকে আরোপ করে। যে যেমন সে ঠিক তেমনি করেই করে। মানুষ সব সময় তার নিজস্ব ক্যাটেগরি অব থট্স্, চিন্তার রকমের মধ্যে রয়েছে। তার সব অনুভূতি ওই চিন্তার রকমের মধ্যে বিরাজ করে। লালন ফকির থেকে আইনস্টাইন সবার বেলা একই কথা। জীবনানন্দও গাছের মধ্যে নিজের চৈতন্যকে দেখতে পেতেন। তাঁর একটি গল্প বলি শোনো। উনি অন্য কবিদের একবার অদ্ভুত একটা কথা শুনিয়ে বললেন, আমি অন্ধকারের তরঙ্গ দেখেছি। তোমরা দেখবে? সত্যিকার তরঙ্গ দেখা যায়। এটা কবিকল্পনা নয়, চাক্ষুষ ঘটনা সেটা। অন্য কবিরা চাক্ষুষ করতে চাইলেন। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা পায়ের কাছে মেঝেয় রেখে সাদিকুল সটান হয়ে চেয়ারে বসলেন। রুমাল বের করে ঘাড় গলা মুখ মুছে প্যানটের পকেটে ফের ঢুকিয়ে রাখলেন। চশমাটা ঠিকমতন নাকে বসিয়ে আমাদের দিকে প্রসন্ন হয়ে চেয়ে দেখলেন। শিরিন দুইচোখে কথা-গুলি গিলে নিচ্ছিলেন। শিরিনের চোখ থেকে চোখ টেনে সাদিক আমার দিকে চেয়ে বললেন—জীবনা-নন্দ তারপর কবিদের দলবেঁধে গভীর রাতে এক গাছতলায় নিয়ে গিয়ে ফেললেন। বিষম অন্ধকার। গাছের তলায় গিয়ে জীবনানন্দ একখানা শুকনো ডাল, ওই গাছেরই ডাল, কুড়িয়ে নিয়ে গাছের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। গাছের ডালে পাতায় গিয়ে আঘাত করা মাত্র সেই গাছের বাসিন্দা পেঁচা আর বাদুড় সশব্দে চেঁচিয়ে উঠে উড়াল দিয়ে শূন্য আকাশে উড়ে গেল। তাদের পাখার ঝাপটা লেগে চারপাশের অন্ধকার কেঁপে উঠল! জীবনানন্দ আঙুল তুলে দেখালেন, ছাখো, কী চমৎকার ঢেউ উঠছে। দেখলে?

আমরাও মনে-মনে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। মামা বললেন—ঘটনাটা একই। গাছকে যাঁরা নামাজ পড়তে দেখেন, তাঁরা প্রাচীন। আর অন্ধকারের গায়ে যাঁরা ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখেন, তাঁরা আধুনিক। এই যা তফাত। কিন্তু কবির তরঙ্গ দেখার মধ্যে কোনো স্বার্থ ছিল না। জীবনানন্দ গাছের কাছে ফল চেয়ে কাঁদেন নি। চেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য। অন্য কবিরা শুধিয়েছিলেন, গাছে যে শুকনো ডাল ছুঁড়ে মারলেন, সেটা কেন? কবি বললেন—ঠিকই করেছি। গাছ তো এখন ঘুমিয়ে। আমি ওরই ডাল দিয়ে ওকে ছুঁয়ে দিলাম। গাছ জাগল না। কষ্ট পেল না। আমারও তরঙ্গ দেখা হল। অন্যরা প্রশ্ন করলেন—পাখিগুলো যে উড়ে পালাল, তাতেও তো ঘুম ভেঙে যেতে পারে? কবি বললেন—না। তা নয়। ঘুমের মধ্যে প্রিয়জনের হাতপা এসে আমাদের গায়ে পড়ে, আমরা দিব্যি ঘুমিয়ে থাকি, এ-ও ঠিক তাই। চলো, গাছ ঘুমিয়ে থাক। আমরা যা দেখবার দেখে নিয়েছি। ...তাই বলছিলাম। বলে সাদিক চুপ করে রইলেন।

—বলুন! অস্ফুট বললেন শিরিন।

সাদিক বললেন—গাছের কাছে ক্ষমা চাইবেন। প্রার্থনা করবেন গাছ যেন ফুটে ওঠে। বলবেন, আমি তোমার ফল নেব না। আমি শুধু দূর থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখব। ব্যস! গাছ তখন খুশি হয়ে...

বলে আর কথা শেষ করলেন না সাদিকুল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে-পায়ে বারান্দায় এলেন। হঠাৎ কী মনে পড়াতে ঘুরে দাঁড়ালেন। আমরাও ওঁর পিছু-পিছু এগিয়ে এসেছি। শিরিন শুধালেন—আচ্ছা সাদিক, লিলির প্রতীকমূল্যটা কী সেটা তো বললেন না?

সাদিক নিঃশব্দে হেসে ফেলে বললেন—আপনার মনে আছে দেখছি। অল্প কথায় বলব। হাতে আর সময় নেই। কালই শহর চলে যাব। একটু এখন তাড়া আছে।

—বেশ। তাই বলুন। শিরিন সম্মত হলেন। সাদিক তখন এতক্ষণ বাদে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন—লিলি পুরুষকে ঠিক সহ্য করে না। বইতে পারে না। গাইডের কথার মধ্যে এইরকম একটা ইঙ্গিত ছিল। তাই না? আবার একটা টান দিলেন উনি। সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে থেমে গিয়ে বললেন—ইউরোপের দেশগুলোর মতন, আমেরিকার মতন, এদেশেও মেয়েদের একশ্রেণীর মধ্যে একটা ট্রেন্ড্ দেখা যাচ্ছে। সেটা ফিমেল লিব নামে চলছে। মেয়েরা তাদের নিজেদের মধ্যে একটা সর্পিল যুদ্ধ, প্রচণ্ড আগ্নেয় নারীসত্তাকে শ্রদ্ধা করতে চাইছে। স্বাধীনতার একটা তুমুল কনসেপট বলা যায়। সেটা ঠিক কিনা জানি না। হয়তো নয়। কারণ সেই ক্ষোভ, নিজেকে সম্পূর্ণ এক রক্তাক্ত জীবন-পিণ্ডে পরিণত করা এবং পুরুষকে দলিত করার ইচ্ছে, যৌন-দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতার স্বাধীন উচ্ছ্বাস পেতে চাওয়ার অভিপ্রায়, এই আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েদের জৈব বৈশিষ্ট্য আর দেহের নারীলক্ষণগুলোর মধ্যেই রয়েছে তার চিরকালের অপমান। তা সেইসব কথা-গুলো ঐ শিবপুর গার্ডেনে গিয়ে লিলিকে দেখে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার খুব ভালো লেগেছিল, ওই বিরাট গোলপাতা, সেই রক্তাক্ত ফুল, বেশ প্রতিবাদী, পুরুষ-বাচ্চাদের ডুবিয়ে দেয়। নেয় না।

বলতে-বলতে সাদিকুল হো-হো হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে চলে গেলেন।

চার

তারপর থেকে শিরিনের সত্যিকার তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। একদিন মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন।

আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললেন—চলো। সিঁদুরি গাছকে সাদিকের কথাগুলো বলে আসি।

আমি চমকে উঠলাম। সাদিক তো মজা করে গল্প বলে গেছেন। হতভাগিনী সেইসব গল্পকে সত্যি মনে করেছেন। সাদিকের কথার এত দাম দিতে হয়? আমি যেতে রাজি না হলে একাই ওই অন্ধকারে চলে যেতে চাইলেন। অগত্যা আমাকেও যেতে হল। এই অবস্থায় গোলোক-পত্নী দেখলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাওয়ার কথা। ভয়ও হচ্ছিল খুব। গাছের কাছে নতজানু হয়ে পাগলের মতন বিড়বিড় করতে লাগলেন শিরিন। ওঁর কেমন নিশির দশা হয়েছিল। কয়েক রাত এইরকম চলল। সাদিকের সব কথা আমি স্পষ্ট বুঝতাম না। সব কেমন অ্যাবসার্ড মনে হত। ধরে নিতাম ওগুলো গল্প। কিন্তু আসলে সাদিক শিরিনকে কী এক দুর্ভেদ্য চৈতন্য দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন। সাদিক শিরিনকে বড়ো জোর আমারই মতন খুকি মনে করতেন। মাঝে-মাঝে এমন কথা বলতেন, যা আমার সামনে বলা উচিত নয়। কিন্তু বোধহয় তিনি ফুলের গল্প, গাছপালার গল্প বলে চিন্তার একটা রকম বা বা পরিমণ্ডল গড়ে কাঁচা-কাঁচা কথার আদলে জীবনের একটা কনসোলেশন খুঁজে দিতে চাইতেন। ভাষার চমকপ্রদ বাক্যবন্ধে গুরুতর সেক্স নিয়েও আলোচনা করতেন। মানুষটা একারণেও আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কখনও অশ্লীল কথা বলতেন না। আবার শিরিনকে যে ভালোবাসেন সে-ইচ্ছেও কখনও ধরতে দিতেন না। উনি যখন চলে যেতেন, শিরিন বড়ো কাহিল হয়ে পড়তেন। তাঁর কথার একটা ম্যাজিক-এফেক্ট ছিল। কিন্তু তখন ধরতে পারি নি, ফিমেল লিব বলে কথাটা যে উনি বলে গেলেন, বললেন, লাজুকলতা নয়, লিলির বিদ্বেষ, দৃঢ়তা, তার বিদ্রোহ, সবই একজনের অন্তরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এনে দিয়েছিল।

বাবা যেদিন শিরিনের ঘরে ঢুকতেন তাহাজ্জুদের নামাজশেষে, সে রাত ছিল অত্যন্ত পাশবিক। শিরিন কাঁদতেন। মনে হত, শিরিনের গায়ে জোর করে কে যেন সুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। এক ধরনের বোবা কান্না শোনা যেত। ধর্ষণের সময় মেয়েরা বোধহয় অমনি করে কাঁদে। মাঝে-মাঝে পশুর মতন গোঁঙাতেন শিরিন। মা কেবল কপালে করাঘাত করে বলতেন—মেয়েটাকে শেষ করে দিলে হাজী। মেরে ফেললে গো।

আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম, কিন্তু শিরিন চাইতেন ফুল ফোটাতে, পারতেন না। একদিন বললেন—আমি পারব না, মিন্নু। আমি পাগল হয়ে যাব।

—কেন পারবে না খালামা? তোমায় পারতেই হবে।

—না, মিন্নু। হয় না। সাদিক আমার সব ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে। ওই গাছ আমায় মৃত্যুর কথা বলে। সমাজ আমাকে অভিশাপ দেয়, আমি কোথায় যাব?

আমি দেখেছিলাম, শিরিনের কনট্রাডিকশন সাদিকের ক্যাটেগরি অব থট্স্-এর মধ্য থেকে সংক্রামিত। লিলির বিদ্বেষ এবং বউলের প্রার্থনা একসাথে মেলে না। লোকটিকে আমার ভয়ও হয়েছিল। তাঁর সফিসটিকেশন, একটা মায়াজড়ানো জাল, বিভ্রান্ত দর্শনের ছায়া, পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের মিশেল, যা মানুষকে সাময়িক মুগ্ধতা এবং সান্ত্বনা দেয়। আখেরে কোথায় টানে কে জানে। পরে একথা আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছিল।

পাঁচ

শিরিন-মাসির কথা বলতে গেলে আমায় অনেক টুকরো-টুকরো দৃশ্যের আশ্রয় নিতে হয়। একদিন স্কুল থেকে ফিরে মাসির সাথে সিনেমায় যাওয়ার প্রোগ্রাম। বাড়ি ফিরে দেখলাম, মাসি কোলের ওপর বোরকা ধরে উদাসীন চেয়ে আছেন জানালার শূন্যতায়। সেজেছেন মাসি। কানে দুল। পায়ে আলতা। নাকে সাদা পাথরের ফুল। গলায় চিকনহার। তার ওপর এখন বোরকা চাপাতে হবে। শাড়িখানাও বেনারসি। সব বৃথা। সব সৌন্দর্য অন্ধকারে ঢাকতে হবে। দেখে বড্ড মায়া হচ্ছিল। অথচ আমার বেলা বোরকার কোনো আবশ্যকতা নেই। এর কারণ বুঝতে পারতাম। একদিন নিশিপিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম সবাই মিলে। বাবাও সাথে ছিলেন। সাধারণত আত্মীয়ের খানাপিনাতেও শিরিনকে সাথে নেওয়া হত না। বাড়িতে এক বুড়ি দাসীর হেফাজতে তাঁকে রেখে যাওয়া হত। সেদিন কী মনে করে ওঁকেও নেওয়া হয়েছিল। বাসে যাচ্ছি আমরা। আমরা বসেছি মেয়েদের আসনে। শিরিন আছেন সব-শেষ প্রান্তে একজন মহিলার পাশে। কিছুক্ষণ বাস চলার পর পাশের মহিলা বোরখার পাশে থেকে উঠে স্টপে নামলেন। জায়গাটা খালি ছিল বলে একজন পুরুষ শিরিনের পাশে বসে পড়লেন। সাথে-সাথে বাবা পুরুষ-আসন ছেড়ে উঠে এসে লোকটিকে বললেন—আপনি যান, আমার সিটে গিয়ে বসুন। লোকটি বেকুফ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক আছে, আমি আর বসব না। লোকটি রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা শিরিনের পাশে আগলে জেঁকে বসলেন। আমার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আমার ছোটো ভাই বেশ বড়ো হয়েও মায়ের দুধ খেত বলে বাবার নির্দেশ ছিল, দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চার দুহাত পেছনে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। নইলে ছেলে মায়ের বুকে হাত দেবে। এই দৃশ্য শিরিনও দেখেছেন। প্রথম যেদিন দেখেন সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়েছিল তাঁর। অস্ফুট বলেছিলেন—হায়! কী নিষ্ঠুর! দুধের বাচ্চাও মায়ের শরীর স্পর্শ করতে পায় না। এ কোথায় এলাম আমি? এ তোমরা কোথায় পাঠালে, মা! ভাইয়া গো! এ কোন্ দুনিয়া!

শিরিন-মাসি বোরখা-কোলে বসে ছিলেন। আমায় দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। নিঃশব্দ সেই কান্না। কোনো শব্দ নেই, একটু অনুকার অব্দি। খানিক পর শক্ত হয়ে বললেন—আমি যাব না, মিন্নু। তুমি একা যাও।

বলে উনি কানের দুল খুলে ফেললেন ড্রেসিং টেবিলের বড়ো কাঁচের আয়নার সামনে টুলে বসে। গলার হার শাড়ি ইত্যাদি সবই খুলতে থাকলেন। আজও সেই দৃশ্য মনে ভাসে। আজও শিরিনের কান্না আমি দেখতে পাই।

ছয়

মাঝে একদিন আবার সাদিকুল এসেছিলেন। বাবা ধর্মপ্রচারে বেরিয়েছিলেন সেই সময়। অনেক রাতে উঠে টিফিন ক্যারিয়ার ভরতি করে টিন ভরতি করে খাবার তৈরি করতে হয়েছিল শিরিনকে। বাবা শিরিনের তৈরি খাবার ছাড়া নেবেন না। শিরিন অসহ্য হয়ে উঠতেন। পাঁচ বেলা নামাজ পড়তে চাইতেন না। তা নিয়েও বাড়িতে বাবার সাথে অশান্তি। অবশ্য আমি ছাত্রী বলে সবকিছুরই বাইরে থাকার অধিকার ছিল আমার। যাই হোক। বাবা কোন্ এক পীরের কাছেও গিয়েছিলেন সেবার। লীগের লোকেরা বাড়িতে এসে বাবাকে না পেয়ে মন খারাপ করেছিলেন। রাত্রিভর ওঁরা আলোচনা করেন। ঘন ঘন চা দিতে হয়। খাবার দিতে হয়। সবই দিতে হয় শিরিনকে রাত্রি জেগে। বোরখা খুলতে হয়, আর পরতে হয়। শিরিন দম বন্ধ করে কেবলই বলেন, মাই লাইফ ইজ হেল। জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি। কী করে হাসি, মিন্নু?

শিরিনকে মাঝে-মাঝে বাবাকে পুঁথি পড়ে শোনাতে হত—আহারে দুলদুলি ঘোড়া, জোর করো থোড়া-থোড়া, যেতে হবে টুঙ্গির শহর। সেই কথাগুলো আবৃত্তি করে শিরিন আপন মনে বলে উঠতেন, কিন্তু কোথায় যাব আমি?

সেই সময় সাদিকুল এলেন। তাঁকে দেখেই শিরিনের প্রথম প্রশ্ন—ফিমেল লিবটা আমি বুঝতে

পারি নি। আর-একবার বুঝিয়ে বলবেন?

সাদিক বললেন—মিনু বরং ওদিকে যাক।

—কেন? ও-ও শুনে রাখুক। কাজ দেবে। অবশ্য সাবধানে বলবেন।

—আমি কি অসাবধানে কিছু বলেছি কখনও? সাদিকুল চোখ বিস্ফারিত করে হাসলেন। শিরিন বললেন— না না, তা কেন? তবে কিনা, আরো বেশি সন্তর্পণে, সতর্ক আর সজাগ হয়ে শুনতে চাইছি তো!

আমি শুধালাম—এইসব কথা শুনে তুমি কী করবে খালামা? জ্ঞান মানুষকে দুঃখ দেয় জান না?

শিরিন বললেন—আমি যে দুঃখই চাই, মিনু। জেনে দুঃখ পাওয়াও আনন্দের। না জেনে কেবল তারাই সুখী হয়, যাদের মস্তিষ্ক মানুষের নয়।

—বাঃ চমৎকার বলেছেন। আমি বলি, নলেজ ইজ পাওয়ার। বললেন সাদিক। শিরিন তখন হঠাৎ করে প্রস্তাব করলেন—চলো আমরা ছাতে যাই। চৈত্রের বিকাল। ভালো লাগবে। তিনখানা বেতের মোড়া নিলেই চলবে। কী বলেন? বাইরে রাস্তায় আইসক্রীম হেঁকে যাচ্ছিল। বললাম—চট করে নিয়ে আসি। খেতে-খেতে গল্প করা যাবে। বলেই আমি নীচে নেমে আইসক্রীম নিয়ে ছাতে উঠলাম। খেতে গিয়ে ছেলেমানুষের মতন তিনজনেরই খুব হাসি পাচ্ছিল। শিরিন মুগ্ধ হয়ে সাদিকের চোখে কিসের ভাব বিনিময় করতে চাইছিলেন। আমি লক্ষ করেছি। চৈত্রের শেষ বিকালের আলো আমাদের গায়ে এসে লাগছিল, একটু মিষ্টি হিম লেগেছিল বাতাসে। মা একবার ছাতে উঠে এসেছিলেন। মাকে বললাম—তুমি একটু আইস খাবে, মা? মা মিঠে হেসে বললেন—তোমরাই খাও, বাছা। সবই তোমাদের ছেলেমানুষি। নেহাত আজ তোমাদের বাপজান নেই।

বলতে-বলতে মা নীচে চলে গেলেন। তখন কথা শুরু হল। আমি কিছুক্ষণ বসে শোনার পর মোড়া ছেড়ে ছাতের অন্যপ্রান্তে সরে এসে পায়চারি করে ঘুরতে লাগলাম। সব কথা আমার শোনা উচিত নয়। মাসির যৌন-জীবনের কিছু সমস্যা আছে বুঝতে পারতাম। সাদিক কথা বলে যাচ্ছিলেন, বারবার আমারও কান উৎকর্ণ হচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম উনি বলছেন, মানুষের সমাজবিকাশের সাথে-সাথে মানুষের সেক্সুয়াল লাইফ কীভাবে স্তরে স্তরে উন্নত হয়ে কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সেটা এখন অনুভূতির এক অতি সূক্ষ্ম স্তরে একটা আর্টিসটিক অ্যাপ্রোচ, লাইফ অ্যাপ্রোচ তৈরি করেছে। পশুত্বের পর্যায়ে মানুষের সেক্স পড়ে নেই। নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক শুধু দেহগত নয়, তার অনেকখানিই মানসিক।

শুনতে-শুনতে শিরিনের মধ্যে যৌন-জীবনের এক সুন্দর আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। সেটা নিবারণ করবে কে? সাদিকুল বলছিলেন—শুনেছি অনেক পুরুষের মধ্যে একটা পাশবিক খাই-খাই ভাব থাকে। নারীর দেহ পেলেই তাদের জিভ কুকুরের মতন ঝুলে পড়ে। এসবই শোনা কথা। আবার এমন মানুষও আছে, যার স্পর্শ অবধি খুব আর্টিসটিক। সবটাই নির্ভর করছে নারীপুরুষের রুচি-অনুভূতির একটা সমান তরঙ্গের ওপর। আমি বই-পড়া কথা বলছি কিন্তু। আপনিই হয়তো ভালো বুঝবেন। এখন কথা হল, কার যে লাজুকলতায় আসক্তি এবং কার লিলির মেরুদণ্ডে মুগ্ধতা, সেটাই প্রশ্ন। মেয়েদের দেখবেন, হাঁটাচলার মধ্যে, বসার মধ্যে একটা কেমন শরীর গোপন করার ব্যস্ততা, চোখ যেন নিজেরই দিকে, এটা ইংরাজ মহিলার হয় না। কারণ বহুকিছু। ওখানেও সেক্স-এর অ্যাপীল থাকে। কোনোটা সামন্ততান্ত্রিক, কোনোটি গণতান্ত্রিক ভ্যালুজ থেকে আসে। মেয়েদের চলার ছন্দেও ঢলানি থাকে। থাকে একটা দৃপ্ত ভাব। তা আমি বলছিলাম, আপনাকে সব জেনেও মানিয়ে চলতে হবে। ফুল ফোটানোই আপনার কাজ। আমি উঠব।

আমি লক্ষ করলাম, মাসি হতভম্ব হয়ে গেছেন। ওঁরা নেমে পড়ছেন আগে-আগে, আমায় ওঁরা লক্ষই করেন নি। পেছনে আমি। সব আগে সাদিকুল। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। সিঁড়িতে ওদের দেখা যাচ্ছে খুবই অস্পষ্ট। ছাতের সিঁড়ি বলে একটা জায়গা খুবই অন্ধকার। মাসি একটা বড়ো রকম ঝাঁপ দিয়ে টপকে নামলেন সাদিকের সিঁড়িতে। বোধহয় সাদিককে স্পর্শ করলেন। সাদিক বললেন—শুনেছি মানুষের একটি চুম্বনের পরমায়ু সারা জীবনের সমান। কী জানি, কথাটার কী মানে? তুমি জান শিরিন?

শিরিন বললেন—তুমি আমায় দেবে?

—কী দেব তোমায়?

—ওই যে বললে সারা জীবনের সমান যার পরমায়ু?

—না, শিরিন। এই অবস্থায় ওটা বড্ড ছেলেমানুষি হবে। তুমি ঘরের বউ। আমি ভ্যাগাবনড। আমার কাছে কথা ছাড়া কিছুই চেও না।

ওই অন্ধকারেই সাদিক সেদিন হারিয়ে গিয়েছিলেন। আমি পিছু হটে ছাতে ফিরে এসেছিলাম। জোর হাওয়া দিচ্ছিল ছাতে। পাতলা একফালি চাঁদ ছিল সন্ধ্যায়। ছাতে ঘুরতে-ঘুরতে আমার বুক খালি হয়ে গিয়েছিল। স্বল্পশিক্ষিতা, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়েটি সাদিকুলের চিন্তার দান গ্রহণ করে করে মনের একটি এমনই গড়ন তৈরি করে নিয়েছিলেন যে আমাদের সংসার তাঁর পক্ষে কারাগার হয়ে উঠেছিল।

সাত

সেদিনও রাত্রে বাবা মাসির ঘরে ঢুকেছিলেন। সেই চাপা ক্রুদ্ধ ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমি মানুষের যৌন-জীবনের কোনো বিকৃতির কী রহস্য জানি না। মাসি কেন চিৎকার করেন, জানতাম না। কেবলই বুকটা শুকিয়ে যেত। এই অসহনীয় ঘটনা বাবার সম্পর্কেও আমায় বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। বাবা বরাবর মাসিকে তাঁর ভুক্তাবশেষ খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। থালায় খেতে-খেতে কিছু অবশেষ রেখে

দিয়ে বলতেন, তুমি খেও, শিরিন। মাসি সেই থালা উঠিয়ে এনে গোরুর নাদায় ফেলে দিতেন দেখেছি। একবার আমারই চোখের সামনে পেঁপের ফালি কুকুরের মুখে ফেলে দিলেন। কুকুর পেঁপে খায় না। শুঁকে দেখল। খেল না। উঠোনে পেঁপের ফালি পড়ে রইল। তা নিয়ে বাবা মাসির ওপর অনেক তম্বি করেছিলেন। মারতেও কসুর করেন নি। বাবার বয়েস হয়েছিল। মাসিকে মারার পর ঘেমে নেয়ে উঠলেন। ধুঁকতে লাগলেন। মাসিকে হাতপাখার ডাঁটি দিয়ে পেটালেন। মাসির গায়ে কালশিটে রক্তাক্ত দাগ হয়েছিল। বাবা মারার পর চেয়ারে বসে ঘন-ঘন পাখা নেড়ে নিজেকে হাওয়া দিচ্ছিলেন আর ধোঁকাতে-ধোঁকাতে বলছিলেন—টাকায় ষোলোটা মেয়ে। একটা ফাউ। মনে রেখো। আলাউদ্দিন খিলজির আমলে তিনটি ছাগল বেচে একটা মেয়ে খরিদ করা যেত হাট থেকে। একটা ছাগল তিনটাকা। একটা মেয়ে ন-টাকা। আমি তোমাকে পাঁচ বিঘে জমি দিয়ে কিনেছি। শহরের মাটি দিয়েছি। মেড়োরা সেখানে বাড়ি বানিয়ে ব্যবসা করছে। শুনছি লস খেয়েছে বলে আড়ত তুলে দিয়ে দেশে চলে যাবে। তখন সেই বাড়ি তোমারই। এত সুখ কে দেয়? আরবের শেখেরা হলে তোমার মতন কসবিকে এই হাটে কিনে ওই হাটে তালাক দিত। তখন তিন টাকাতেও তোমায় কেউ কিনত না। তা বলে, আমি তোমাকে সাদিকের হাতে ফাউ-তোলা দিতে পারি না। শালা যে লোভে-লোভে আসে, সব মতলব চিনি। তবে কিনা, জালি ছোকরা বলে মাপ পেয়ে যাচ্ছে। ঘরের বউ পরপুরুষের সাথে এত কথা কিসের বলে? বাবা আড়ালে সাদিককে এই ধারা বলতেন। সামনে পেলে আরব মুলুকের গল্প করতেন, কাফেরদের কেচ্ছা শোনাতেন। ইব্রাহিমের পাথর মক্কায় রয়েছে। নাম হাজারে আস্‌য়াদ। তাতে হাজীরা চুমু দেয়। এতই তার আকর্ষণ, মুখ তুলতে ইচ্ছে হয় না। এতই তার টান। দুই ঠোঁট শক্ত আঠার মতন লেগে যায়।

বুঝলে সাদিক, সংসারটাই এইরকম। ছোটো বউ হল সেই হাজারে আস্বয়াদ। টেনে ধরে আছে। ছাড়ে না। ছাড়াতে পারি না। হেঃ হেঃ! সবই খোদার কুদরত। মেয়েরা হল, তোমাদের ইংরাজি ভাষায়, ম্যাজিক-স্টোন। হাজারে আস্বয়াদ। তাই কিনা?

বাবার কথা শুনে সাদিক নিজেকে কাহিল করে হাসতেন। বলতেন—শুনেছি, হাজীরা যখন ঐ পাষাণে পাগলের মতন চুমু খায়, ছাড়তে চায় না, তখন পুলিশ ওদের জোর করে তুলে দেয়। গুঁতোয়। গলায় ধাক্কা দিয়ে তোলে। ভেরি ডিসটারবিং।

—ঠিক বলেছ সাদিক। মোক্ষম কথা।

—আমি তবে সেই পুলিশ।

—অ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ তাই।

বলেই দুজন চোখাচোখি চোখ মটকে হাসতেন। আমারও মনে হয়, আমাদের সংসারে সাদিকুল সত্যিই ডিসটারবিং এলিমেনট। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য।

সেই রাতেও ধীরে-ধীরে একসময় কান্না স্তিমিত হয়। তারপর সব ঠাণ্ডা। তারও কিছু পরে পড়া ছেড়ে মায়ের ঘরের দিকে জল খাওয়ার জন্য গিয়ে দেখি মেঝেয় ওরা বসে। মা আর মাসি। মাসির শাড়ি এলোমেলো। চোখ মুখ থমথমে। যেন সর্বাঙ্গে ঝড় বহেছে। গালে গলায় আঁচড়। আমি বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাসি বলছেন—আমাদের নিম্নাঙ্গের যে নারী-চিহ্ন, তোমায় বলি বুবু, ওটা একটা কদর্য কুৎসিত জন্ম-দাগ। আমার কোনো রোমাঞ্চ নেই, বুবু। আনন্দ পাই না। কেন বুড়ো আমায় জ্বালাতন করে! একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক লোক, আমায় গমন করুক, আমি চাই না। খাব-দাব আর রস বিলোব, আমি পারব না। আমার ঘেন্না করে। আমার ঘরে বুড়ো কেন খোমেইনির ফটো টানিয়েছে? ওই ছবির দেখে কখনও নামাজ হয়? আমায় সেদিন নজরুলের ফটো টানাতে দিলে না। কেন? বলো? গাছে ফল হয় না বলে আমায় দোষী করা কেন? ওই গাছ যেমন ভয় পায়, আমিও পাই। যেদিন বুড়ো আমায় প্রথম ছুঁয়েছে, সেইদিন থেকেই আমার ভয়ের শুরু, বুবু। এই ব্যাপারটা দুনিয়ার কেউ বুঝবে না।

বলতে-বলতে মাসি মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার কড়া নামাজি গলা শোনা যাচ্ছিল। তখনও ঘুমের জড়িমা জড়িয়ে আছে চোখে। কে যেন বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। আমি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলাম। অন্ধকারে দাঁড়ালাম চুপচাপ। মাসিই কাঁদছে। কোথা থেকে খানিকটা আলো মাসির কুণ্ডলী-পাকানো দেহে এসে পৌঁচেছে। মাসি বারান্দায় পড়ে আছে। লুটিয়ে পড়েছে। কী হল আজ? আজ কি অন্যরকম কিছু? বাবার নামাজ শেষ হল। বাবা জায়নামাজ গুটিয়ে রাখলেন চাঙ্গারিতে বারান্দার। মায়ের ঘরে এলেন। মাকে বাবার সেই খাদালো নরম তুলোর ভেজা-ভেজা গলায় বললেন—কুলসম! যা হবার হল। কেউ যেন না শোনে। মুখ ফসকে গেছে। তুমি তাবৎ জিন্দেগি এই ঘটনা চেপে থেকো। যদি কখনও ফাঁস হয়, তুমিও রেহায় পাবে না। আগাম এক তালাক তোমায় দিয়ে রাখলাম।

এইটুকু বলেই বাবা নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। মাসি বারান্দায় পড়ে রইলেন। কাঁদতে লাগলেন, অনেক রাতে একলা অন্ধকারে শিরিন কখন এই সংসার ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন, আমরা জানি না।

আট

শিরিনের কোন খবর ছিল না কিছুদিন। বাবা খোঁজ করে জানলেন শিরিন ওঁর বড়ো ভাইয়ের কাছে রয়েছেন। বড়োভাই কোর্টের মুহুরি। ধাত-কড়া মানুষ। হাজীর সাথে বোনের বিয়ে দিয়ে তাঁর কিছু আফশোস ছিল। বাবা ভরসা করে সেখানে যেতে পারলেন না। মাকে পাঠালেন। মা বহু সাধাসাধি করেও শিরিনকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। মা এসে বাবাকে বললেন—আমাকে কেন পাঠাচ্ছ তুমি? আমি কী করতে পারি?

আমি মাকে প্রশ্ন করলাম—শিরিনখালামাকে কেন তুমি অমন করে ফিরিয়ে আনতে চাইছ, মা?

মা বললেন—তোর বাপের জন্য, মিন্নু। তুই তো দেখেছিস, তোর বাপ কেমন করছে। মন থেকে তালাক তো উনি দেন নি।

আমি বললাম—মন থেকে তালাক কজনই বা দেয়?

মা বললেন—ওটাই পুরুষের ধর্ম।

বললাম—পুরুষ বোলো না। বলো মুসলমানের দাপ।

মা চুপ করে রইলেন। বাবা মাকে আবার পাঠালেন বউতলির রজব মুহুরির কাছে। মা বিরস মুখে ফিরলেন। অসহায় শিশুর মতন বাবা একটা মন-পাগলামির আব্দার ধরে মায়ের আঁচলের তলায় ফিরতে লাগলেন। দুজন পাশাপাশি বসে কেবলই মনস্তাপ করছেন বলে মনে হত। দেখতে-দেখতে একটা বছর গড়িয়ে গেল। আমি মাধ্যমিকের ফাইনাল দেবার জন্য শহরের বাড়িতে এলাম। মাকেও সাথে বেঁধে আনলাম। মা দিনে-দিনে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। পরীক্ষার সময়টায় একজন অঙ্কের গৃহ-শিক্ষক দরকার ছিল। আমার এক শহুরে বন্ধু আমায় একদিন একটা চমৎকার খবর বহে এনে বললে—ঘরে এসে পড়িয়ে যাবে, আমি তোমাকে তেমনি একজন শিক্ষিকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এবং ভদ্রমহিলা মুসলমান। ওঁরা এই শহরে একটি টিউটোরিয়াল হোম খুলেছেন। ওখানকার প্রধান শিক্ষকের নাম সাদিকুল খান। ভালোমানুষ। দারুণ ইংরাজি, ইতিহাস পড়ান। সপ্তাহে তিনদিন করে ৬দিন দুজনে পড়াবেন। লোকটি একটু খ্যাপাটে গোছের। সে যাই হোক, পড়া নিয়ে কথা। তুমি যদি পড় শিওর ফার্স্ট ডিভিশন পাবে। শহরে সবার মুখে-মুখে নাম। হোমে গিয়েও পড়তে পার। বাড়িতে এলে ফী একটু বেশি, প্রায় দুই-তিন গুণ। তা-ও আগেভাগে না বললে, আসবেন না। আমি চেষ্টা করব? আমি রোজই তো হোমে যাই।

বন্ধুটিকে মুখে কিছু না বলে চুপচাপ পোশাক পালটে মুখে একটু ক্রীম ঘসে মায়ের কাছে গেলাম। তখন সকাল দশটা বেজে গেছে। বললাম—মা, আমরা একটু সাদিকমামার কাছে যাচ্ছি।

মা তো অবাক। বললেন—সাদিক মামা? কোথায় থাকে ছেলেটা?

—এখানে, এই শহরেই থাকেন। ছেলেমেয়েদের পড়ান। আমি ওঁর কাছে একটু ইংরাজিটা দেখিয়ে নোব।

—বেশ যাও। ওকে জিয়াফত করে এসো। বলবে, মা ডেকেছে। ওর সাথে পরামর্শ আছে।

শুধালাম—খালামার কথা তুলবে নাকি? ওসব তুলো না।

মা বললেন—বিপদের সময় আত্মীয়ের পরামর্শ নিতে হয়। সাদিক যদি চেষ্টা করে শিরিন ফিরতেও পারে। আমি ওকে বউতলি পাঠাব।

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। বন্ধুর সামনে নিজেকে সংযত করে বললাম—যা করবে আমার পরীক্ষার পর করবে। নইলে ফেল করলে আমার দোষ দিও না।

মা বললেন—বেশ-বেশ, তাই হবে। তুমি এখন যাও।

বন্ধুর সাথে রাস্তায় নেমেই মনে হল, মা শিরিনের দুর্বল জায়গাটা বোঝেন। ঘটনার পরিণাম ভাবতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরছিল। বন্ধু পাশে থেকে অবাক গলায় শুধাল—মাসটারমশাই তোর মামা বুঝি? তোর কী ভাগ্য! ভদ্রলোকের প্রফেসর হওয়া উচিত ছিল।

আমরা একটা রিকশা করে মামার ছোটো বাড়ির

কাছাকাছি এসে থামলাম। বন্ধুটি রিকশা থেকে না নেমে বলল—আমি স্যরের সামনে যাব না, মিন্টু। বকবেন। বাঘের মতন করে চোখ পাকিয়ে বলবেন—রাস্তায় এতক্ষণ খোলামকুচি দিয়ে এক্কা দোক্কা খেলছিলে বুঝি? তুমি ভাই একলা যাও, তোমারই তো মামা।

বন্ধু কিছুতেই যেতে চাইল না। রিকশা ছেড়ে দিল। অগত্যা একাই আমি। এক বছরেরও বেশি সময় সাদিকমামা আমাদের জীবনে অনুপস্থিত। ছোটো বাড়ি। পাশে প্রকাণ্ড ডোবা। ডোবার ওপারে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের ওধারে কমার্স কলেজ। তার ঠিক উলটো উত্তরে জলঙ্গী বাসস্ট্যানড। একখানা-মাত্র ঘর। নীচু ছাদ। প্রাকৃতিক ক্রিয়া কোথায় করেন, স্নান খাওয়া? ঘরে তালা বন্ধ। ফিরে আসছিলাম। এমন সময় দেখি পাকা সড়ক ধ'রে মামা এদিকেই এসে গলিতে ঢুকলেন। পাঁচ মিনিট পর মুখোমুখি। দেখেই সোৎসাহে বললেন—ইউ সুইট লেডি, কাম ফ্রম মুন। গতকাল পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চেয়ে তোমায় মনে পড়ছিল। ভালো আছ?

সেই সাদিক মামা। ভীষণ রোমানটিক ভদ্রলোক। কথায় কথায় যিনি গল্প ফাঁদতে পারেন। যাঁকে আমার ভীষণ ভয়ও করে। অথৈ একটা মানুষ। আমাদের মনে করেন খুকি। এই প্রথম তাঁর মুখে লেডি কথাটা শুনলাম। বুঝলাম, আমি বড়ো হয়েছি। মামা তালা খুললেন। ডাকলেন—এসো। মামার মুখে প্রচুর দাড়ি গজিয়েছে। গোঁফে আচ্ছাদিত মুখ। যেন এক ইংরেজ কবি। দুই চোখ উন্মনা। চোখে এখন চশমা নেই। ছোটো একখানা চৌকি। অতিশয় ছোটো টেবিল। ক্ষুদ্র শেলফ-এ কিছু বই। দেয়ালে ঝুল-লাগা রবীন্দ্রনাথ। বিছানার চাদরটা আধ-ময়লা হয়েছে। দড়িতে জড়ো করে ঝোলানো একটি সাদা জামা আর পানজাবি। চৌকির তলায় একটা টিনের বাকস। একটা স্টোভ। বোঝাই যাচ্ছে, উনি হোটেলে খান। সরকারি রাস্তার ট্যাপ থেকে বালতি করে জল এনে রঙিন মগে স্নান করেন। গোলাপি তোয়ালে আর টুথব্রাশ আছে। সাবান-কৌটোয় শস্তা সাবান। সিনেমাতারকাদের প্রিয়। ব্যস। এই হচ্ছে একটি মানুষের আস্তানা। এত বড়ো মানুষটার এই হাল! কখনও জীবনে চাকরির চেষ্টা করলেন না। রাজনীতি করেন এমনই যে সেই রাজনীতি জীবনে কখনও তাঁর প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। প্রতিষ্ঠা মানে, চাকরি বাকরি ইত্যাদি। চৌকিতে বসে বললাম—আমি আমার বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে আপনার কাছে এলাম। সামনে আমার পরীক্ষা। আমায় ইংরাজিটা একটু দেখিয়ে দেবেন? শুনলাম, আপনার হোমে একজন মুসলিম শিক্ষিকা ভালো অঙ্ক করান। একটু বলে দিন না, উনি আমায় পড়িয়ে আসবেন। তারপরই বললাম—আপনি কেমন আছেন?

উনি বললেন—আই অ্যাম অলওয়েজ ইন ফ্লেবার। চায়ের অনুষঙ্গে মেশানো এই ইংরাজি তাঁর নিজস্ব। একটু থেমে বললেন—তোমাদের দেখতে পাই না, এই যা দুঃখ।

শুধালাম—আপনি আর গাঁয়ে যান না কেন?

—সময় হয় না। তা ছাড়া হোমটা চালাচ্ছি। চারজন শিক্ষক। সবাই আমার মতন আঁটকুঁড়ে হত-ভাগ্য। আমার আরো ছাত্রছাত্রী দরকার। সব স্টুডেন্টদের বলছি, ওরা ওদের বন্ধুদের আমার হোমে নিয়ে আসুক। বেশ, তুমি পড়বে বই কি। আমি সময় পাব না। পড়তে হলে হোমে আসতে হবে। তবে মহিলাটি তোমার বাড়িতে গিয়েই পড়িয়ে আসবে।

—আপনি না পড়ান, মায়ের কাছে একবার দেখা করতে···

—হ্যাঁ। অবশ্যই। যাব। উনি কি এখানেই আছেন?

—আমাদের এখানেই বোধহয় পারমানেনট থাকতে হবে। গোলোকবাবুরা যাচ্ছেতাই করছে। বাচ্চা-বাচ্চা হিন্দু ছেলেদের ট্রেনিং দিচ্ছে। সকাল-বেলা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল করে যায়। বাবাও খুব ভয় পাচ্ছেন। আমাদের শহরে এসে থাকাই ভালো। অন্তত কিছুদিন।

সাদিকমামা বললেন—তোমরা শিরিনের কোনো খোঁজ নিয়েছিলে?

—নিয়েছি। মা শিরিনকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। উনি আসেন নি।

—তোমরা ওকে ফিরিয়ে আনতে চাইছ কেন?

—আব্বাজী চাইছেন, শিরিন ফিরে আসুক।

—কেন?

বলেই মামা কেমন একধারা হেসে ফেলে বললেন—বুঝেছি। কিন্তু ও-যদি সত্যিই না ফেরে, তোমরা কী করবে?

আমি বললাম—না ফেরাই তো উচিত। কলা-গাছ একবার কেটে ফেললে, তাতে আর কোনো কাজ হয় না। নতুন করে ট্যাঁক গজাতে হয়। মা বলেন, মেয়েরা কলাগাছ। ঠিকই বলেন। তবু কেন যে মা···

—বলো।

—না। থাক। আপনি একবার মায়ের সাথে দেখা করুন। যাচ্ছেন তো? মা আপনাকে আজ রাতে নেমন্তন্ন করেছেন।

—আজ?

—কেন? কোনো প্রোগ্রাম?

—না। ঠিক আছে। যাব।

—আমি তবে উঠছি।

—হ্যাঁ। এসো।

আমি চলে এলাম। সন্ধ্যায় সাদিকুল এলেন। মা ওঁকে চানা মাখিয়ে মুড়ি আর তেলেভাজা বড়ো বাটিতে এগিয়ে দিয়ে বললেন—তোমার সাথে আমার বড্ড জরুরি দরকার, সাদিক।

মামা বললেন—জানি।

মা বললেন—জানবে বইকি। শুনেছি, ওই তালাক শুনলে নবীর রেহেল কেঁপে যেত। আল্লার আরশ কুর্সি (সিংহাসন), সাত তবক (স্তর) আশ-মান থরথর করে কেঁপে যায় ভাই রে। তবু বে-আক্কেলে বুড়ো ওই নোংরা কথা মুখে আনলে। ওকে তোমরা ক্ষমা করে দাও।

মামা মুড়ি চিবিয়ে যাচ্ছিলেন। দ্রুত চিবিয়ে ফেলে জল খেলেন। সব মুড়ি খেলেন না। বললেন—চা খাব, বুবু।

মা বললেন—চা হচ্ছে তোমার জন্যে। আগে একগেলাস দুধ আর মণ্ডা খাও। সাগরপাড়ার মণ্ডা। তুমি আমার অতিথি। মেহমান।

—উদ্দেশ্য?

হঠাৎ মামার কথা আমিও বুঝতে পারলাম না। মামা তখন ভেঙে বললেন—এত মেহমানি আদরের বহর কেন বুবু? রফা? আপস-রফা? ওকালতি? আমি শিরিনকে বুঝিয়ে তোমার সংসারে ফিরিয়ে দেব? আমি ফিরিয়ে দিতে পারি, এটা তোমার মনে হচ্ছে কেন?

মা ঠাণ্ডা গলাতেই বললেন—কেন মনে হচ্ছে, সেটা মনেই থাক সাদিক। ভেঙো না। আমি সব-কিছুর সাক্ষী। আমি তো ছেলেমানুষ নই। বিদ্যে নেই। কিন্তু বুদ্ধি তো ছিল, ভাই।

মামা মণ্ডা খেতে-খেতে বললেন—কিন্তু সবই তো একজনের ব্যক্তিগত অভিরুচি, পারসোনাল অ্যাফে-য়ার, ডিসিশন, বুবু। ও এই শহরেই আছে। ওকেই কনভিনস কর না কেন। আমি আজই ওর সাথে দেখা করে ওকে তোমার কথা বলে দিচ্ছি।···বুবু বুঝবেন কিনা সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না। ইংরাজি মিশিয়ে, বলার ঝোঁকে বলে, মামা তাঁর কথাগুলো শেষ করলেন। তখন শিরিনখালামা এই শহরেই আছেন শুনে মা আমার চোখে কেমন রহস্য করে তাকালেন।

মা বললেন—আমি কী বোঝাব ওকে? তুমিই বোঝাও। তোমার কথা বুঝবে! আমি বুঝিয়ে পারি নি। আমি কি শিরিনকে বড়োবোনের ভালোবাসা দিই নি, সাদিক? আমার কি কোনো দাম নেই?

তুমিই ওর সব হল? এতদিনের সংসার কিছু না? সংসারে থাকতে গেলে অমন একটু হয়ই। বুড়ো তো ওকে তালাক দিতে চায় নি। বুড়োর হাল একবার চোখে দেখবে না তুমি?

মামা দুধের সাথে মণ্ডা শেষ করলেন। তারপর জল খেলেন আরো এক গেলাস। আমি এনে দিলাম। রুমালে কষ রগড়ে পকেটে রাখলেন। বললেন—কথাটা সেখানে নয়, বুবু। তালাক হাজী দিতে চান নি। কেন দিতে চাইবেন? তালাকটা শিরিনের বড়ো প্রয়োজন ছিল?

—কী বললে, প্রয়োজন ছিল?

—ছিল না? নিশ্চয় ছিল। তোমাদের খুদা ওকে আশীর্বাদ করেছেন। রাত্রে যেদিন পালিয়ে আমার কাছে এল। তার সেদিন বড়ো সুখের রাত্রি। তাবৎ দিন কী আশ্চর্য ঘুমিয়ে রইল মেয়েটা। তবু তোমার খাতির, সব ওকে বলব।

মা রাগত গলায় বললেন—কে কাকে খাতির করছে, বাছা। তুমি তোমার আপন তালে বলে চলেছ। সবই তোমার বইয়ের ভাষা, নিজের ভাষা বলতে পার না? গোদা বাঙলায় বলো, তালাকের প্রয়োজন ওর ছিল না। ছিল তোমার। ওই চাহিদা তুমিই ওর মধ্যে খাড়া করেছ। গল্প পেলে দিন সারি, পালকি মেরে করব ফিকিরি। তোমার ফিকির কেউ ধরতে পারত না, মনে কর? আমার আর হাজীর স্নেহ তোমায় খাল কাটতে সুযোগ দিয়েছে। তার প্রতিদান দিলে এইরকম। ছিঃ ছিঃ, ভাবতেও ঘেন্না হয়!

—আহ্ মা! তুমি এসব কী বলছ? চুপ করো। আমি আর সইতে পারছিলাম না। মা কিন্তু থামতে চাইলেন না। বললেন—ঠিকই বলছি, মিনু। ওই ছেলে সব সর্বনাশের মূল। কত ঘরের বউয়ের চোখের পানি ঝরিয়েছে আমি জানি না? ছেলেবেলা থেকে ওর সব ইতিহাস মুখস্ত। বরাবর ওর বিয়ে-হওয়া মেয়েদের দিকে লোভ। একবার বড়ো বাড়ির ছোটো বউকে নিয়ে ছেলেবেলায় কী কেলেঙ্কারি না করেছে। আমিই সব নিরস্ত করেছি। এবারও শিরিনকে তোমায় ফেরত দিতে হবে। মেয়েদের চোখে যত পানি ফেলেছ তুমি, সব একদিন ওই দুইচোখ দিয়ে ঝরাতে হবে। কেন, তুমি একটা কুমারী মেয়েকে প্রেম করতে পার না? সেটা বুঝি রোচে না তোমার? চরিত্রহীন ছেলে!

সাদিকুল আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। মাকে কোনো কথা না বলে আমার হাত ধরে টানলেন। বললেন—আয়। আয় মিনু। তোর সামনেই কথা হবে। মামার গলা কাঁপছিল।

—না। না। সে কী! আমি অস্ফুট গলায় মায়ের চোখে চাইলাম। মায়ের চোখে সন্ধ্যার আলো পড়ে চকচক করছিল। মা চোখের ইশারায় সাদিকুলের সাথে যেতে বললেন। মামা এক ঝটকায় আমায় রাস্তায় টেনে এনে ফেললেন। রিকশা করলেন দ্রুত। উঠে পড়লাম। প্রায় বিশ মিনিট পর একটি গলিতে রিকশা ঢুকল। আমি চিনতে পারলাম, বাড়িটা আমাদেরই, মাড়োয়ারি পরিবার থাকত। দোতালায় উঠে কলিং বেল টিপলেন মামা। শিরিন ঘর থেকে সাড়া দিলেন—এসো। এতক্ষণে সময় হল বুঝি! তুমি কিন্তু নিজেই দুখানা টিকিট করেছিলে, ছবি-খানা মন্দ ছিল না। এলে না দেখে···

সিনেমার কথা বলছিলেন শিরিন। কথা থেমে গেল। আমরা ঘরে ঢুকে পড়েছি। আমায় দেখে ভূত দেখার ভয়। মুখ শুকিয়ে গেল। অস্ফুট বললেন—তুমি এসেছ! রিকশায় কোন কথা বলেন নি মামা। চুপচাপ গম্ভীর ছিলেন। শিরিন একখানা শাড়ি ভাঁজ করছিলেন। সেটা আলনায় রেখে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, আমায় দেখে উনি খুশি হন নি। মামা একটি চেয়ারে বসে আমায় খাটে বসবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন—দেখো মিনু, প্রবলেমটা আমাদের সবার। তুমিও কথা বলবে। মানে কনভিনস করবে। তবে তুমি বিশ্বাস করতে পার, আমি তোমার খালামার কোনো ক্ষতি করি নি। ও নিজেই এই বাড়িতে এসেছে। আমি ওর দুটি অন্নের ব্যবস্থার জন্য হোমে অঙ্কের মাস্টারি দিয়েছি। তোমাকে কাল থেকেই পড়াতে যাবে। ও তো তোমাদেরই। তবে তোমাকে আমি আমার দোষের কথাও বলব একদিন। আমি কুমারী মেয়েদের প্রেম করতে পারি না, কিন্তু শ্রদ্ধা তো চাই। ইউ হ্যাভ কাম ক্রম মুন। তোমরা রুপালি মানবী। চন্দ্র-লোকের কুসুম। তাই কিনা?

বলেই সাদিকুল আপন মনে হাসতে লাগলেন। শিরিন ঢুকলেন ঘরে। শুধালেন—তোমরা ভালো আছ, মিনু?

বললাম—আব্বাজীর বুকের হাঁফটা বেড়েছে?

মামা বললেন—ওরা তোমায় আকাশ-পাতাল খুঁজছে, শিরিন। তাই মিনুকে নিয়ে এসেছি।

—কেন? আমায় খোঁজার কী আছে!

মামা বললেন—কাল থেকে মিনুকে অঙ্ক শেখাতে যাবে। বুবুও এসেছেন। বড্ড কান্নাকাটি করছেন। তোমায় যে কী ভালোবাসেন···

শিরিন ফোঁস করে উঠলেন—মিছে কথা। এক-দম মিছে কথা। ভালোবেসে যে লোক মানুষকে খানিক নোংরা বিষ্ঠা এগিয়ে দেয়, তার ভালোবাসাকে কী নাম দেবে? আমার কষ্টের কথা সবচেয়ে ভালো করে তাকেই বলেছি আমি। সেকথা তুমিও জান না। তারপরও সে আমায় বোঝাতে আসে পাঁকের নাম পদ্মফুল। সবচেয়ে ঘৃণার কথা কী জান? বুড়ো ওকে তালাকের ভয় দেখিয়ে আমার কাছে পাঠাচ্ছে, আর ও দিব্যি চলে আসে আমার হাত ধরতে! ওর বহিন-গিরি অসহ্য।

আবার শিরিন এ ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। বোধহয় রান্নাঘরে। খুব চমৎকার করে সাজানো এই ঘর। প্রশস্ত খাট। ভারি তোশক। ধপধপে বিছানার চাদর। সুন্দর টেবিল। প্রকাণ্ড দামি কাঠের আল-মারি। সোফা। চেয়ার। সব আছে। সব পালিশ-করা। মেঝেয় মোজায়েক। মাড়োয়ারি খুব পয়সা ঢেলে গড়েছিল। মাসিক ভাড়া থেকে তৈরির খরচ কাটানো হচ্ছিল। নিদেন এই বাড়িতে ওরা ভাড়া না দিয়ে পনর-বিশ বছর থাকতে পারত। যাই হোক, এখন সেই বাড়ি সম্পূর্ণ খালামা শিরিনের। আমাদের এই বাড়িতে কোনো অধিকার নেই। এখানে জীবনকে নিয়ে গুছিয়ে বসা যায়। শিরিনের চোখে জীবনের সেই ইচ্ছে দানা বেঁধে গেছে। মাসি একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন—কোনো মেয়েই বোধহয় আবদুল মাঝি টাইপের বরের স্বপ্ন দেখে না। ছুঁচলো তার দাড়ি। গোঁফ তার কামানো। মাথা তার নেড়া। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। রবি ঠাকুরের ইলিশ আর কচ্ছপের ডিম ধরা আবদুলের গল্প। পদ্মার মাঝি আবদুল। তোমার বাপকে দেখে আমার সেই আবদুল মাঝির আদল মনে পড়ে। তুমি কখনও জীবনে এমন বরের স্বপ্ন দেখতে পার মিনু?

কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। খুব তন্ময় হয়ে শিরিন-খালামায়ের বরের গল্প শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ মামার কথায় অন্যমনস্কতা নষ্ট হয়ে গেল। সম্বিত পেয়ে শুনলাম, শুনলাম মামা বলছেন—দেখলে মিনু, কেমন অবুঝ হয়ে গেছে। ও ভয় করছে, আমিও বুঝি কখন ওর শত্রুতা করব।

আমি বললাম—আমার হঠাৎ করে এখানে আসা ঠিক হয় নি সাদিকমামা। আমায় আপনি রিকশায় তুলে দিন। আমি চলে যাই।

সাদিকুল কিছুক্ষণ চুপ করে হাতের নখ খুঁটতে থাকলেন। ঘাড় গোঁজ করে রইলেন। দু-একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন অন্যমনস্ক। গভীর চিন্তা করছেন উনি। হঠাৎ বলে উঠলেন—আমার একটা দোষের জায়গা আছে। আমি শিরিনকে প্রলুব্ধ করেছি। কেন করেছি, সেটা তোমায় বলব, মিনু। একদিন নিশ্চয় জানতে পারবে। আমি চরিত্রহীন, কথাটা একদম মিথ্যে নয়। আমার পারভারশন

আছে। একটা খুব নীচু রুচির প্রবৃত্তি আছে আমার মধ্যে। অমি অসুস্থ।

কথা শুনে আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। দেখলাম, উনি মায়ের কথায় ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন। বললাম—এভাবে বলছেন কেন? আপনার দোষ কী ছিল? খালামাকে সাহস দিয়ে একটা পাঁক থেকে তুলে আনলেন। মানুষকে সেন্স দেয়া তো অন্যায় নয়। তাছাড়া, শুধু সেকারণেই খালামা এখানে এসেছেন, তা-ও নয়। খালামার আজকের জীবন দৈব-লব্ধ ব্যাপার। যাকে ইংরাজিতে গড-গিফটেড বলে। আপনি একদিন এইরকম একটা গল্প বলেছিলেন আমাদের। ছাতের ওপর মাদুর বিছিয়ে সেই গল্প আমরা শুনেছি।

মামা খুশি হয়ে বললেন—তোমার মনে আছে? নাউ ইউ আর মাই বেসট ফ্রেনড। আমি এই জীবন-এর সপক্ষে এতদিন একটা স্ট্রং যুক্তি খুঁজছিলাম। গল্পটা মনেই ছিল না। সেই রাজকুমারীর গল্পটা, তাই তো?

শিরিন আবার এলেন। বললেন—দুজনে চোরের মতন কথা বলছ কেন? আমরা কারো ঘরে সিঁদ করি নি।

মামা মাসিকে মৃদু ধমক দিয়ে উঠলেন—তুমি এত উত্তেজিত হও কেন? সমস্যা অনেক গভীর। লঘু করে দেখা ঠিক নয়। বুবুর ধারণা, আমি, কেবল আমিই তোমাকে হাজীর সংসারে ফেরত পাঠাতে পারি।

—পার নাকি?

—বুবু বলছেন।

—বুবু যা খুশি বলুন। তুমি নিজে কী বলছ? তাড়িয়ে দেবে? ভিখিরি করে দেবে? এখন দেখছি, কথা ছাড়া সত্যিই তুমি কিছুই পার না। আমি জানতাম, বুবু তোমায় প্রেসার দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইবে। বলি নি তোমায়? এতদিনেও কোর্টে মামলাটা তুমি করলে না। আমি ওই বুবুকে আদালতে তুলব। আমার একমাত্র সাক্ষী ও। জীবনের পুরোটাই বাজি ধরেছি, সাদিক। শুধু তোমার মুখের কথায় ভুলি নি। একজন মেয়ে, একজন মেয়ের জন্য কতখানি করে, মিনু তুমি বুবুকে বলবে, সাধের বোন, পরানের পরান, বলবে বুবুকে, আমি সেই বোনের কাছে দাবি করছি, আমার আপীল, বুবু কোর্টে সত্য কথা বলুক। একটি মেয়ে, অবলা, আর-একজন জীবন-অভিজ্ঞ মেয়ের কাছে, জীবনের মুক্তি চাইছে। বুবুই আমার আদালত। হ্যাঁ সাদিক, আমি সেই আগ্নেয় জীবনপিণ্ড। দাহ ছাড়া কিছুই নেই আমার।

বলতে-বলতে শিরিনের বোধহয় মাথা ঘুরে উঠল। ধপ করে উনি সোফায় ঢলে পড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—তোমায় বলি। প্রার্থনা করি, কারুকে বলে দিও না, আমার বিদ্যে নেই। স্কুল ফাইনাল পাশ-করা টীচার। হোমের ছাত্র-ছাত্রী কমে যাবে। দুমুঠো অন্ন পাই। আমাদের ভাতে মেরো না, মিনু। বলে উনি ক্লান্ত হয়ে চোখ বুঁজলেন।

আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারছিলাম না। মাসির গা ছুঁয়ে বললাম—আমি তোমার বন্ধু ছিলাম খালামা। হয়তো কখনও কোনো ব্যাপারে তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করেছি, নিজে কখনও অনিষ্ট করি নি।

মাসি হঠাৎ আমার হাত দুখানি জড়িয়ে পাগলের মতন ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ সেই কান্না গলে-গলে ঝরল। মাসি একসময় চুপ করলে আমি বললাম—আমি যাচ্ছি, খালামা।

মাসি মুখ তুললেন। বললেন—যাবে? আমি একলা থাকি। রোজ যদি একবার এসে দেখা দাও, আমার মন ভালো থাকে। এখানে এলে আমি তোমায় পড়াতে পারি। বুবুর কাছে কখনও যাব না, মিনু। যেতে বোলো না।

আমি উঠে পড়লাম। সাদিকুল কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

রাস্তায় নেমে রিকশা ডাকলেন। আমি রিকশায় উঠে পড়লাম। মামা সহসা বলে উঠলেন—আমার কথার ধার পড়ে গেছে। শিরিন নিজের মনের মতন চিন্তা করতে শিখেছে। বলেই উনি রিকশায় আমার পাশে উঠে বসলেন। রিকশা চলতে শুরু করলে বললেন—সামনেই আমি নেমে যাব। তারপর পথে-পথে অনেক রাত অব্দি একলা ঘুরে বেড়াব। পার্টি অফিস যাব একবার। রাত্রে আমি অন্ধকারের তরঙ্গ দেখতে পাই। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একদিন অন্ধকার ভালো লাগে। শ্রীকান্ত পড়েছ?

—হ্যাঁ।

—প্রথম পর্বের গোড়ার দিকেই কোথাও এক জায়গায় শ্রীকান্ত কবিত্ব সম্পর্কে জোর অনীহা দেখিয়ে বলছে, শ্রীকান্ত লোকটি কবিত্বের বাষ্পশূন্য একজন খাঁটি গদ্যের মতন শুকনো মানুষ। পোড়া চোখে গাছকে গাছ দেখে, পাথরকে পাথরই দেখে। মেঘকে মেঘই মনে হয় তার। মেঘের দিকে চেয়ে থেকে ঘাড় ব্যথা করে ফেলেছে, মেয়েদের মাথার একরতি চুল অব্দি দেখতে পায়নি। চাঁদের মধ্যে প্রিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হয় নি। বড়ো বেড়ে বলেছেন শরৎবাবু। আবার সেই লোকই জীবনে একদিন শ্মশানে গিয়ে অন্ধকারের রূপ দেখে মুগ্ধ। এই দেখতে পাওয়াটাও জীবনে সব সময় হয় না। আমি যেমন অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাই না।

—সে কী! কেন?

—ওটাই আমার দোষ, মিনু। একদিন সব বলব। কিন্তু শিরিন তেমনি এক অন্ধকার। অবধি নেই। শেষ নেই। বড্ড অবাক করে দুই চোখ টেনে রাখে।

মামা চুপ করে রইলেন। খানিক বাদে আমিও কেমন নিজেকে কোথায় নিঃসঙ্গ এক ভাবনার আবর্তে হারিয়ে ফেলেছিলাম। রিকশা কি থেমে ছিল? হঠাৎ পাশে দেখি মামা নেই। অন্ধকারে কোথায় মিশে গেছেন। বাঁ হাতে মামার সেই বিশাল অন্ধকার মাঠ খাঁ খাঁ করছে। এই অন্ধকারে একলা চলতে-চলতে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল আমার। আবিষ্কার করলাম, আমি কাঁদছি। খুব গোপন এক আকুলতা আমায় কাঁদাচ্ছে।

নয়

বলাই বাহুল্য, আমি পরীক্ষা ভালো দিতে পারি নি। পরীক্ষার পর মা গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। আমিও শহরে একা। ঘরে একজন রান্নার মেয়ে ছাড়া কেউ নেই। শহরের এক লাইব্রেরির মেমবার হয়ে গেলাম। সেখানেই একদিন মাসির সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। মাসি বা সাদিক কারো সাথেই উপরের ঘটনার পর দেখা করি নি। ওঁরাও কেউ আমার খোঁজ করেন নি। মাসিকে বললাম—তোমার সাথে দেখা করি নি বলেই যেটুকু হবার হল, ভালো-মন্দ একরকম। নইলে সেটুকুও যেত। আমি পরীক্ষার কথা বলছি। এইভাবেই সেদিন মাসির সাথে কথা শুরু হল। মাসি একখানা নতুন প্রকাশিত উপন্যাস ইস্যু করিয়ে আমার হাত ধরে বললেন—তুমি বই নিয়েছ? চলো একটু দুজনে ঘুরব। বলে লাইব্রেরির করিডোর ডিঙিয়ে রিকশার জটলার চৌমাথায় এসে থামলেন মাসি। মাসিকে জীবনানন্দের কবিতার কোনো এক নায়িকার মতন করুণ উজ্জ্বল রূপসী মনে হচ্ছিল, এবং গোধুলি মদির। সূর্য তখন ডুবুডুবু। আমরা এক মনোহারি দোকানে এসে থামলাম। মাসি তার নির্দিষ্ট প্রিয় সেনট আর সাবান কিনলেন। তারপর মিষ্টি করে হেসে বললেন—মেয়েরা যখন রোজগার করে সেই পয়সায় নিজের প্রিয় জিনিস কেনে, তখন তার রোমাঞ্চ আলাদা। আমি কিছু পয়সা জমাচ্ছি, বুঝলে? সেই পয়সায় একটুকরো মাটি কিনব। ঘর করব।

—কেন, সাদিকমামা?

—ওর কথা বাদ দাও। তোমাদের মেড়োর বাড়িতে তো চিরকাল থাকা যাবে না।

—ওটা তোমারই বাড়ি।

—কে বলেছে আমার বাড়ি! যে হাজী ঐ বাড়ি আমায় দিয়েছে, সেই হাজী তো আমার নেই। অতএব ওই বাড়িও ঠিক আমার নয়। ওই বাড়িতে বেশি দিন থাকলে, তোমাদের খোঁটা লাগবে। আমি চাই না।

হাসতে-হাসতেই বললাম—তুমি বেশ মেয়ে!

—কেন? এতে বাহবার কী আছে, যা সত্যি তাই বললাম।

আমি কোনো কথা না বলে মাসিকে রিকশায় ফেরার পথে বারবার চোখের কোণে দেখতে থাকলাম। শেষে প্রস্তাব করলাম—মা নেই। বাড়ি ফাঁকা। চলো ওখানে গিয়ে খানিক আড্ডা মেরে তোমার বাড়ি চলে যাব ছুজনে।

—যাবে?

—নিশ্চয় যাব। যাব না কেন?

—আমার কাছে রাতে থাকবে?

—থাকব বৈকি!

—কথা দিচ্ছ?

—হ্যাঁ।

আমরা রিকশা থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকে কাজের মেয়েটিকে বললাম—রাতে একা থাকতে হবে। দরজা এঁটে কষে ঘুম দেবে। আমি খালামার কাছে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর আমরা বেরিয়ে যাব।

মাসিকে বললাম—মা নারকোলনাড়ু করে রেখে গেছে। মুড়ি দিয়ে খাবে? টাটকা সরষের তেল আছে। মাখিয়ে আনব?

মাসি ঈষৎ কড়া হয়ে বললেন—না। থাক। আমি শুধু কফি খাব। তুমি কফি ভালোবাস বলে চাইছি। নিজে হাতে করে দিতে হবে।

—এই গরমে কফি ঠিক জমে না।

—গরম কোথায়? শীত এখনও যাই-যাই করছে, যাচ্ছে না।

—নাইস বলেছ। তবে তাই হোক। বলে আমি কফি বানাতে গেছি, এমন সময় বাবার কণ্ঠস্বর। বুক হিম হয়ে গেল। মাসিকে এখানে এনে কী ভুল করেছি আমি? মাসি আমায় হয়তো ভুল বুঝবেন। কাজের মেয়েটাকে বানাতে বলে বাইরে এলাম। দেখি দেয়ালে পাঁচখানা সাইকেল। ক্যারিয়ারে বেডিং বাঁধা। ওরা পাঁচজন উঠে এলেন। পাঁচজনই লীগের লোক রাজনীতিতে, ধর্মে বিশেষ জামাত করেন। তবলীগ করে বেড়ান। বেশির-ভাগ সময় সাইকেল করে ঘোরেন। রাত্রে এখানে থাকবেন বোঝাই যাচ্ছে। প্রত্যেকে মুসলমানি পোশাক পরেছেন। চুস্ত আর কলিদার। গলায় জড়ানো লম্বা রুমাল। মক্কা-মদিনার ছাপ। মাথায় গোল টুপি। মুখে কারো কাঁচাপাকা দাড়ি। কারো ভীষণ কালো সুন্নত।

—ছুজনের মধ্যে কোন্‌টা আপনার ছোট গিন্নি? প্রশ্ন একজনের।

মাসিকে দেখালেন বাবা। দ্বিতীয় জনের মন্তব্য —এ তো বাড়িতেই রয়েছে দেখছি। পালিয়ে গেছে বলছিলেন?

বাবা বললেন—পালিয়ে আর যাবে কোথায়! একটু বিরাগ মতন হয়েছে। আপনারা দোয়া করুন। ভালো-ভালোয় সুমতি করে উনি যেন কালই বাড়ি ফেরেন। আমার সংসার উরাল যাচ্ছে বড়েমিঞা। কালই সবাই মিলে কিসের যেন হোম হয়েছে, ওখানে গিয়ে মাস্টারদের মেহেরবানি চাইব। আর্জি করব। কী বলেন? একটু থেমে, এই হচ্ছে আমার একমাত্র মেয়ে মনোয়ারা, ডাক নাম মিন্নু। বললেন বাবা। বললেন—আমার প্রথম তিন ছেলে মারা গেছে হঠাৎ-হঠাৎ। এক মেয়ে, সে-ও গেছে কলেরায়। তারপর এই মেয়ে। পরের ছুই ছেলে বাড়িতে দেখলেন। এই আমার একমুঠো সংসার। কেন যে আলগা হয়ে গেল। সবই খোদার মর্জি। এবার শিরিন, তোমাকে ঘরে ফিরতে হবে।

কাজের মেয়েটি কফি এনেছিল। ভেবেছিলাম; মাসি খাবেন না। কিন্তু দিব্যি খেয়ে যেতে লাগলেন চুপচাপ। নিংড়ে খেয়ে টেবিলে কাপ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আমায় বললেন, চললাম মিন্নু। কাল দেখা কোরো।

মাসি একবারও পেছনে ঘুরে চাইলেন না। অন্ধকারে রিকশার ঘণ্টি দ্রুত রাস্তায় চলে গেল মিলিয়ে যেতে-যেতে। আমি বললাম হোমে যাবেন কেন আপনারা?

—কেন যাব, সে কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে নাকি? যা ভালো বুঝছি, আমরা করছি। তুমি চুপ করে থাকো। বাবা গর্জন করলেন। রাত্রে আর কোনো কথা হল না।

খুব সকালেই ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। রাতে ওঁদের কী যুক্তি হয়েছিল জানি না, সেদিন ওঁরা হোমে না গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন। সাতদিন পর টিউটোরিয়াল হোমের সামনে পাঁচ মুরুব্বির উদয়। তখন ক্লাস চলছে। অঙ্ক কষাচ্ছিলেন মাসি। বোর্ডে হাতে ধরা চক ভেঙে পড়ল। মাসির সমস্ত চেতনা থরথর করে কেঁপে উঠল। ওঁদের দেখে ছাত্রছাত্রী অধিকাংশ হিন্দু, প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সাদিক বললেন—কী চাই আপনাদের?

একজন বললেন—আমরা আমাদের মেয়ে চাই। ঘরের বউ চাই। তুমি ওকে ছিনিয়ে এনে রাস্তায় ব্যাবসা খুলেছ। একটা অর্ধশিক্ষিত মেয়েকে ফুঁসলে এনে ভালো-ভালো ছেলেমেয়ের মাথা খাচ্ছ তুমি। বেঈমান। চোর। নির্লজ্জ। এ কেমন পণ্ডিতি তোমার সাদিক? ওই অবস্থাতেই মাসি চৈতন্য হারিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন। সাদিক নির্বাক। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। ছুটি ঠোঁট কেবল থরথর করে কাঁপছিল। মাসি সেই থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হোমে যেতে পারলেন না। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হঠাৎ দ্রুত বন্যার জলের মতন কমে গেল। ফেরার পথে লীগের রাজনীতি-করা শহুরে মোল্লা মৌলানাদের চাউর করে গেলেন, ওই হোম অপবিত্র হয়ে গেছে। ফলে মুসলিম ছেলের সংখ্যা আরো কমে গেল। মাসি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছাত্রদের মধ্যে সাদিক সম্পর্কে যে প্রবল শ্রদ্ধা ছিল, তা কিছুটা নষ্ট হয়েছিল এই ঘটনায়। কিন্তু প্রকৃত আঘাত এল অন্যদিক থেকে। আরো ছুইজন যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা হিন্দু। কুন্তল রায় আর জনার্দন সেনগুপ্ত। হোমের বাড়িটা ছিল জনার্দনের। জনার্দন সহসা বেঁকে বসলেন। বললেন —আমরা আরো কোয়ালিফায়েড টীচার পাচ্ছি, সাদিক। শিরিন অঙ্কেও খুব ভুল করেন। তা ছাড়া মুসলিম মেয়ে বলে দেখলে তো, কী কাণ্ড হয়ে গেল। ঘরের বউ ঘরে ফিরে যাক।

একটু থামলেন জনার্দন। বললেন—এটা গোঁড়া মুসলিম এলাকা, অথচ মুসলিম ছেলে বরাবরই কম। শিরিন আসার পর সেই সংখ্যা আরো কমে গেল। ওটা আর উঠবে না। রুটিমহলের ওদিকে জমিদার-পট্টি। প্রচণ্ড গোঁড়া সব। লীগকে ভোট দেয়। আমি ওদের বোঝাতে পারছি না, ভাই। ওরা কখনও এই রকম হোমে মেয়ে টীচারই দেখে নি, তারপর তোমার মুসলমান। তারপর ঘর-পালানো বউ। ঢি ঢি পড়ে গেছে, আমার হোমের বদনাম হয়ে গেল। তুমি থাকো। কারণ তুমিই হোম গড়েছ, শিরিন বরং···

সাদিকুল ম্লান হেসে বললেন—তোমারও সংস্কার কম নয়, জনার্দন। যাকে টীচার করে আনতে চাইছ, সে-ও কিন্তু লেডি। তোমার এক পরিচিতা। তাই নয়? হিন্দু হলে, ওইরকম ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে না। তুমি ভালো করেই জান, হাজীর সাথে শিরিনের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ঘটনা হিন্দুর হলে, শিরিনের পক্ষেই ছাত্রছাত্রী অভিভাবকের সহানুভূতি পাওয়া যেত। হাজীর জবরদস্তিকে তুমি ঘৃণা করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা তোমারই মধ্যে সংস্কার, জনার্দন, ঘরের বউ ঘরে যাবে। মুসলমানের বউ, হাজীর পত্নী, পরহেজগার। ধম্মে লাগে। তাই না?

—এসব কথা বলতে পারলে, সাদিক? আমি অতশত ভেবে বলে নি। আমি হোমটা রক্ষা করতে চাইছি। হোম উঠে যাক, তুমিও চাও না।

অভিমান বাজিয়ে কথা বললেন জনার্দন। তারপর কুন্তলের সমর্থন চাইলেন—তুমি কী বল কুন্তল ?

কুন্তল এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন—আমি আর কী বলব ? যার হোম সে-ই তো বলছে। যাকে রাখবার রাখবে, ফেলে দেবার হলে ফেলবে। এটা তো গবমেনট-রিকগনাইজড চাকরি নয়। তবে আমার কথা হল, মান-ইজ্জতের কোশ্চেন যখন উঠেছে, সব দিক ভেবেই বলছি, সাদিক ভাই, তুমি আর আমাদের মধ্যে থেকো না। রাখতে হলে দুজনকেই রাখতে হবে। শিরিন তো চলে যাব, ফিরে যাব বলে আসে নি।

একটু দম ফেলে বললেন কুন্তল—কিন্তু জনার্দন চাইছে, সুচেতা হোমের টীচার হোক। বি. কম. পাশ করেছে, এমন কিছু কোয়ালিফিকেশন নয়। এই সাদিক ডবল এম. এ. সেটা কেন ভুলে যাই ? কোয়ালিফিকেশনের কথা তোল কেন ? একটা সামান্য প্রাইভেট হোম, এখানেও বিদ্যের বহর নিয়ে কথা ? তুমি বলছ, শিরিন অঙ্ক ভুল করে, কোথায় ভুল করে অঙ্ক ? ইলেভেন টুয়েলভ অব্দি ও নির্ভুল অঙ্ক কষায়। ডিগ্রিটাই সব হয়ে গেল তোমার ? আমি এই কূট তক্কে ঢুকতে চাইছিলাম না। সুচেতা আসবে, তার জন্য শিরিনকে যেতে হবে কেন ? ওপরের অঙ্কগুলো সুচেতা করাবে। নীচে থাকবে শিরিন। অ্যাকর্ডিং টু কোয়ালিফিকেশন। সমস্যা ছাত্র। ছাত্র কি বাড়ানো যায় না ? সুচেতা জনার্দনের বন্ধু, বেশ তো বন্ধুর উপকার হোক। সেটাই যখন কথা।

জনার্দন খেপে গেলেন, তবু কেঁপে-কেঁপে বললেন—সেটা কোনো কথা নয়, কুন্তল। কে কার উপকার করে ? আমি অত হীন ইচ্ছে নিয়ে কথা তুলি নি। আমি শুধু হোমটাকে বাঁচাতে চেয়েছি।

পাশের ঘরে কথা হচ্ছিল শিরিনের বাড়িতে। আমরা এ-ঘরে থেকে সবই মোটামুটি জানালা দিয়ে শুনছিলাম। মাসি শুয়ে ছিলেন। ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। হঠাৎ দুম করে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি সভয়ে ওঁর পিছু-পিছু গেলাম। মাসি বললেন—জনার্দনবাবু, আপনার হোম আপনারই রইল। আমরা আর যাচ্ছি না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে শুনে যান, আমি আসলে এখন কারো বউ নই। আমায় কেউ ছিঁনিয়ে আনে নি। আমি একাই এসেছি। স্রেফ একা। যান, চলে যান আপনারা। আমি অসুস্থ, একলা থাকতে দিন।

জনার্দন উঠে পড়লেন। কুন্তলও। যাবার সময় কুন্তল শিরিনের কাছে এসে বললেন—যুদ্ধ তো কেবল শুরু, শিরিন। দেখতে চাই সোনাভান কেমন অসি চালায়।

—আমার যুদ্ধ বোধহয় শেষ হয়ে এল, কুন্তল। আমি যে হেরে যাচ্ছি।

কুন্তল বললেন—হারলে তো চলবে না। এই শহরে তোমাদের দুজনকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেদিন তোমরা বিয়ে করবে, আমি সেদিন আধমন বাতাসা কিনে রাস্তায় ছড়াতে-ছড়াতে যাব। আমার এক মামা, ভালো মোক্তার, ডিভোর্সের মুসাবিদা ভালো করেন। একদিন তুমি আর সাদিক এসো, আমি ব্যবস্থা করে দেব। আজ যাই। পরে আসব আবার। লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না শিরিন। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর দিতে হবে। চলি।

আদালতে মামলা উঠল।

দশ

দুদিন পর মাড়োয়ারির কোথাকার এক ভাগ্নেকে এনে, সেই মাড়োয়ারির চিঠি দেখিয়ে শিরিনমাসিকে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন বাবা। যেদিন ওঁকে নামিয়ে দেয়া হল, সেদিন মা আবার এই শহরে ফিরে এলেন। এসেই শুনলেন, মাসি ও-বাড়িতে নেই। মা কথাটা শুনে খুশিই হলেন মনে হল। পৃথিবীর এক নতুন নাটক দেখলাম আমি। মায়ের কি এই ছিল সতীন-বিদ্বেষ ? নাকি মানুষের স্বামী-ভক্তির রূপটাই এমন নির্মম ?

তারপর তিন মাস কেটে গেছে। আমার পরীক্ষার রেজালট বেরিয়েছে। কলেজে একাদশ ক্লাশে ভর্তি হয়েছি। জানতাম না, আদালতে মামলা হয়েছে। একদিন বাড়িতে কোর্ট থেকে নোটিশ এল। তার বয়ানে বোঝা গেল, মাকে কোর্টে সাক্ষী দিতে হবে। খালামায়ের একটিই সাক্ষী, একমাত্র বিশ্বাসের ঠাঁই। কিন্তু ওঁদের আমরা আর দেখতে পাই না। শিরিন কিংবা সাদিকুল। কোথায় ওঁরা চলে গেছেন। একদিন হোমে গেলাম। কুন্তল কিছুই বলতে পারলেন না। দুঃখ করে বললেন—ওই মেয়েটির নাম সুচেতা, মাথায় সিঁদুর। দশ দিন আগে জনার্দন বিয়ে করেছে। বোঝো !

একটু ক্ষণ চুপ করলেন কুন্তল। তারপর বললেন, আমি এই হোমে আর থাকব না। সাদিকুল কোথায়। আছে, ঠিক জানতে পারব। মোক্তারমামাও কিছু বলতে পারছেন না। সামনে সাত তারিখ কোর্টের ডেট। তুমি ওই দিন যেও।

—না। আমি গেলে বাবা গলা কেটে ফেলবে। ওর এখন ইজ্জতের সওয়াল। বাবা কোরান হাতে করে লীগের মওলানাদের সামনে কসম খেয়েছে তালাক দেয় নি বলে। গত রাতেও মাকে বলছিল, কুলসম, তোমার হাতে আমার ইজ্জত বাঁধা। কসম খেয়েছি, সেই কসমের মান রেখো। নইলে আমি সংসার জ্বালিয়ে দেব। রাস্তার কুকুর বেড়াল করে দেব। আমি উসমান জমাদারের পোতা। মা ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

কুন্তল বললেন—তবে তো 'কেস' ফেভারে আসবে না। শিরিন হেরে যাবে। মুসাবিদায় তোমার মাকে সাক্ষী করে হাজী তালাক দিয়েছে বলা হয়েছে। অতএব শিরিন হারছে। আমি অন্যভাবে 'কেস' তৈরি করতে বলেছিলাম। শিরিন তা কিছুতেই শুনলে না। এখন কী হবে ?

—কী হবে, আপনিই বলুন ? অসহায় শোনাল আমার গলা।

কুন্তল বললেন—আমি কী বলব, মিনু ? বলবেন তোমার মা। যাক গে, এখন কী হয়, দেখো।

বলে কুন্তল সিগারেটের বোঁটা জুতোর তলায় পিষলেন। তারপর অন্যমনস্কের মতন ক্লাশে চলে গেলেন। আমি আর দাঁড়ালাম না।

দিন পনেরো পর হোমে আবার গেলাম। দেখলাম, কুন্তল চাকরি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছেন। মাসিকে জানবার সামান্য শেষ সূত্রও ছিঁড়ে গেল। বুকের ভেতরটা কেমন করে কাঁদত আমার, কাউকে বোঝাতে পারব না। একদিন পার্টি অফিসে গিয়ে খোঁজ করলাম। শুনলাম, সাদিকুল পাটনা গিয়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। শিরিনের কথা পার্টির লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হল। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। ওঁরা শিরিনের খবর জানতেন। এরপর আমার সামনে কেবল মা আর মা। মায়ের চেহারায় বার্ধক্য নেমেছে স্পষ্ট হয়ে হঠাৎ-ই কয়দিনে। মাকে আব্বার পাশে বেমানান লাগত। মনে হত, মা আর্ধেকবয়েসী বউ। স্বামীর বয়স ডবল। শিরিনকে মনে হত আব্বার মেয়ে। কিন্তু মা এত বুড়িয়ে গেলেন কেন ? বিকাল হলে মা একটা রিকশা করে আমায় সাথে নিতেন। মায়ের চোখে চেয়ে বুঝতাম উনি যেতে-যেতে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কাকে যেন খুঁজছেন। একদিন ভিড়ের মধ্যে কাকে দেখে মা 'শিরিন' 'শিরিন' বলে চিৎকার করে উঠলেন। সত্যিই তো ! শিরিন-মাসি। ভুল করে রিকশা চলার বেগে অনেকখানি মাসিকে ছাড়িয়ে চলে এসেছিলাম। রিকশা থেকে নেমে, আমরা মাসিকে আর দেখতে পেলাম না। তারপর থেকে মায়ের রিকশা চড়ার দম বেড়ে গেল। মা বেশি-বেশি কোরান আর নামাজ পড়তে লাগলেন। তছবি গুনতে শুরু করলেন। ছোটো ভাই রাজাকে সাথে রাখতেন। নামাজ পড়ে তছবি গুনে রাজাকে কাছে ডেকে মাথায় ফুঁ দিতেন। গায়ে হাত বোলাতেন। মায়ের চোখে

জল ভরে আসত। থুতনিতে হাত রেখে রাজার চোখে ভীষণ করুণ করে চাইতেন। এই দৃশ্য মনের ওপর একটা আশ্চর্য ছাপ ফেলেছিল আমার। বুঝতে পারতাম, শিরিন-খালামায়ের জন্য মায়ের বড্ড কষ্ট হয়। কিন্তু সেকথা মুখে প্রকাশ করতে পারেন না। আবার ভাবতাম, এই কষ্টেরই কি কিছু মানে আছে?

একদিন আমাদের শহরের এই বাড়িতে কুন্তল এসে আমায় ডাকলেন। কুন্তলকে মা চেনেন না। বললাম—উনি আমার বন্ধুর দাদা। এই বলে পথে নেমে আসতেই কুন্তল বললেন—খোঁজ পেয়েছি, মিনু। শিরিন ভাকড়ি ছাড়িয়ে ওদিকে একটা বস্তিতে থাকে। একটা পাঠশালা খুলেছে। কী দুরবস্থা কল্পনা করা যায় না। সাদিক কেমন হয়ে গেছে। ঠিকমতন ছেলে-পিলে পড়ায় না। পার্টির কাজে মেতে থাকে।

স্টপে এসে বাস ধরলাম আমরা, মিনিট বিশ-পঁচিশ পর বাস ছেড়ে হাঁটা পথ। দুপুরবেলা, গরমও পড়েছে দাউ দাউ। একটা কাঁচা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘর থেকে শিরিন বেরিয়ে এসে মিষ্টি হেসে আমাকে দেখলেন। খুব নরম করে শুধালেন—ভালো আছ?

আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' করলাম। কুন্তল বললেন—মোক্তারমামা বলেছেন, মাড়োয়ারির তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে। লোকটা ফল্‌স্‌ লোক। তুমি চলে আসার এক মাসের মধ্যে পালিয়েছে। ঐ তালা আখতার হাজী 'ফিট্‌' করেছে। তোমরা না পার, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে আমি ভেঙে ফেলব।

মাসি বললেন—ওই বাড়িতে যেতে আমার পা সরে না।

—পা সরাতে হবে, দরকার হলে, বাড়ি বেচে সেই টাকা কোনো অনাথ আশ্রমে দেবে। তবু দখল রাখবে না, তা হয় না।

কুন্তল গজগজ করতে লাগলেন। মাসি নরম করে বললেন—ঠিক আছে। ও আসুক। বলব।

কুন্তল গলায় জোর দিয়ে বললেন—বলব নয়। শীগগির গিয়ে দখল নিতে হবে। লড়তে নেমেছ, কোমর সিধে করে থাকো। মামলায় কী হয় দেখে, একটা যা হোক স্থির করব। কিন্তু তার আগেই এই বস্তি ছেড়ে ঐ বাড়িতে যেতে হবে। আমরা দাঁড়াব না। সাদিককে বলবে, আমরা এসেছিলাম। কী মিনু, তোমার কোনো কথা নেই?

বললাম—না। না তো!

মাসি আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুধালেন—তুমি সত্যিই কিছু বলবে না, মিনু?

বললাম—তোমায় মা খুঁজছে খালামা। মায়ের বড়ো কষ্ট।

শিরিন এই কথা শুনেই দ্রুত ভাঙা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে শেকল তুলে দিলেন। কুন্তল কতবার ডাকলেন। মাসি সাড়া দিলেন না। মাসি একদম ছেলেমানুষ। এত শস্তা অভিমান কোথাও দেখি নি।

বাড়ি ফিরতেই মা বারবার আমার আশেপাশে ঘুরতে লাগলেন। শুধালেন—তোর খালা-মায়ের সাথে দেখা হয়েছিল? সাদিক কেমন আছে? কথা বলছিস না কেন?

আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন—তুমিও আমাকে বিশ্বাস কর না বুঝি? আমি কি সবখানিই খারাপ, মা? এই বুক কি এতই পাষাণ? তবু চুপ করে আছি দেখে বলে উঠলেন—পেটের মেয়ের কাছেও আজ আমি ছোটো হয়ে গেছি। হায় খুদা! সব আমার পর হয়ে গেল।

বললাম—কোর্টে সবার সাথেই দেখা হবে। এখন খুঁজে কী করবে? আমি অন্য কাজে গিয়েছিলাম।

এগারো

আজ কোর্টে মায়ের সাক্ষী হয়ে গেল। মাকে সাথে করে আমি আদালতে নিয়ে গিয়েছিলাম। মা আদালতে দাঁড়িয়ে কোরান হাতে শপথ করলেন, যা বলবেন, সত্য বলবেন, সত্য বই মিথ্যে বলবেন না। এই কোরান হাতে ছুঁয়ে বাবা লীগের লোকেদের সামনে কসম খেয়ে বলেছেন, শিরিনকে উনি ত্যাগ করেন নি। দুনিয়ার কাকপক্ষী তালাক শব্দটি তাঁর মুখে উচ্চারিত হতে শোনে নি। অতএব স্বামী যখন কসম খেয়ে সব অস্বীকার করেছেন, সেখানে স্ত্রী কেন পাপের ভয় করবেন। মা আদ্যোপান্ত সব ঘটনা স্বীকার করলেন, শুধু বললেন, হাজী সাহেব তালাক দিলেও আমি শুনি নি, আমি সে সময় ঘুমিয়ে ছিলাম।...

শিরিনখালামাকে আদালত উকিলের মুখে প্রশ্ন করেছিলেন—হাজীসাহেব আপনাকে তালাক দিয়েছেন বলছেন, আপনাকে তালাক দিলেন কেন?

শিরিন বললেন—সেটা হাজীই বলতে পারেন। আমার অপরাধ আমি জানি না।...তখন উকিল প্রশ্ন করলেন—সাদিকুলকে আপনি ভালোবাসতেন, অবৈধ সম্পর্ক গড়েছিলেন, এটা কোনো অপরাধ নয়? হাজী সাহেবের সাংসারিক মান সম্মান সবই তো ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর আপনি একরাতে চুপ করে সাদিকুলখানের কাছে শহরে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনা কি মিথ্যা? সাদিকুলকে প্রশ্ন করা হল—হাজী সাহেবের বাড়িতে আপনি কিসের আকর্ষণে যেতেন? একটা পর্দানসীন বাড়ি। কুলসম আপনার দূর সম্পর্কের বোন, সেই সূত্র ধরে যেতেন। তাই তো? তারপর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। আপনি শিরিন আখতারকে কানে মন্ত্র দিলেন। শহরে পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন, স্বাধীন জীবনের লোভ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই কিনা! বলুন? তারপর উকিল গলা চড়িয়ে 'ইওর অনার' বলে আদালত কাঁপিয়ে বললেন—শিরিন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। কারণ হাজী-সাহেবের নামে তাঁর কোন অভিযোগের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি না। তাঁর অভিযোগ একটাই, বক্তব্য একটাই, হাজীসাহেব তাঁকে সুস্থ মাথায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার কোনো সাক্ষী ইহলোকে নেই। কেন তালাক দিলেন, তার উপযুক্ত কারণও ফরিয়াদী পক্ষ উপস্থিত করছেন না। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায়, উপযুক্ত কোনো কারণ শিরিনের জানা নেই। মুহূর্তের উত্তেজনায়, সামান্য একটা স্বপ্নের তাড়নায় উনি গৃহত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় টিউটোরিয়াল হোমে গিয়ে আপন স্ত্রীর খোঁজ নেওয়া দায়িত্বশীল স্বামীর কাজ বলে মনে করলে অপরাধ হয় না।

ঠিক এই সময়, দেখা গেল, শিরিন কাঠগড়ায় অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। এইদিন আদালত রায় দিলেন না। দিন পনেরো পর আবার আদালত এই মামলার তারিখ ঘোষণা করলেন। মাকে রিকশায় করে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আগাগোড়া বেশ রঙ মিশিয়ে আদালতের এই কাহিনী 'ইসলামী দুনিয়া' পত্রিকায় সবিস্তারে ছাপা হল। লীগের মুখপত্র এই 'ইসলামী দুনিয়া' বাবার পক্ষে এক নির্ভরযোগ্য দোস্ত। প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো-বড়ো হরফে ছেপেছেন, হাজীপত্নী অপহৃতা, মুসলমান যুবকের বেইমানি, সাক্ষী কুলসম বিবি।

পরের দিন ভোরে বাবা মুড়ি চিবতে-চিবতে এই উপাখ্যান পাঠ করছিলেন। একটু আগে কোরান পাঠ করছিলেন। আমি ভাকড়ির বস্তির দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। মা তছবি গুনে রাজার মাথায় ফুঁ দিচ্ছিলেন।

বস্তির কাছে এসেই চোখ পড়ল বাড়ির সামনে একখানা ঘোড়াগাড়ি। মালপত্র ওঠানো হচ্ছে। কুন্তল আর সাদিকুলকে দেখা যাচ্ছে। একটু পর শিরিন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। আমি এগিয়ে গেলাম। ওঁরা আমায় প্রথমে কেউ কোনো কথা বললেন না। গাড়িতে স্বল্প কিছু বাক্সপেঁটরা ওঠানো হলে শিরিন উঠলেন। কুন্তলও উঠে বসলেন। তারপর সাদিকমামা আমার দিকে চেয়ে বললেন—তুমিও ওঠো।...আমি কোনো কথা না বলে নিশ্চুপ গাড়িতে গিয়ে বসলাম। শেষে মামা আমার পাশে এসে বললেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। মামা বললেন—অনেক দিন তোমায়

খুঁজছি। ঢের কথা আছে তোমার সাথে। কোর্টে কথা বলবার ফুরসত হয় নি। আমরা এখন প্রথমে থানায় গিয়ে ডাইরি লেখাব। পরে মাড়োয়ারির ঘরে গিয়ে তালা ভাঙব। সবই কুন্তলের ইচ্ছে। মোক্তার-মামার নির্দেশ। আমাদের মামলাটা গোড়াতেই কাঁচা ছিল। হেরে যাব জানতাম। শিরিনও কোর্টে দাঁড়িয়ে মাথা ঠিক রেখে উপযুক্ত জবাব দিতে পারে নি। তোমার মা যে ওইধারা বলতে পারেন, ও নাকি এখনও সেকথা ভাবতে পারছে না।

কুন্তল পাশে থেকে তেতো করে বললেন—হাজী যে কত বড়ো জল্লাদ সেকথা একবারও শিরিন বলতে পারত, ওকে একদিন মেরেছে পাখার ডাঁটি ভেঙে, সেকথা বলা কি যেত না?

শিরিন বললেন—ওটা কোনো অত্যাচার নয় কুন্তল। ওর অত্যাচারের আসল চেহারা কেউ দেখেনি।

—তবে সেটা কেন বললে না?

—সেকথা বলা যায় না, কুন্তল!

—কেন যায় না?

—তুমি ঠিক বুঝবে না। বুবু কোর্টে এসে রিকশা থেকে নেমেই রাজাকে আমার কাছে ইশারায় ঠেলে দিলে, সে-দৃশ্য কেউ তোমরা দেখ নি। রাজার মুখ দেখে আমার ভেতরটা কেমন হয়ে গেল, সাদিক।

সাদিক বললেন—কিন্তু তোমার মুখ দেখে বুবুর তো কিছু হল না?

শিরিন আর কোনো কথা বললেন না। কুন্তল বললেন—তুমি চেয়েছিলে বুবু তোমার সব ফয়সালা করে দেবে! দরকার হলে সাদিকের সাথে বিয়ে দিয়ে ফুলশয্যার বিছানা পেতে দেবে। চমৎকার!

গাড়ি এসে থানার কাছে থামল। কুন্তল আর সাদিক নেমে গেলেন। পনেরো মিনিট সময় লাগল ওঁদের। সেই ফাঁকে মাসির সাথে আমার কিছু কথা হয়েছিল। বললাম—তুমি সাদিকমামাকে নিয়ে খেলা করলে, খালামা। বেচারি এখন কী করবেন?

—তুমিও এমনি করে বলছ, মিনু? মাসি অস্ফুট ডুকরে উঠলেন। বললেন—সব দোষ আমারই হল? কোর্ট যে আমার কথা ভালো করে শুনতেও চায় নি।

ওঁরা ফিরলেন। গাড়িতে উঠে কেউ আর কোনো কথা বললেন না অনেকক্ষণ। কুন্তল একসময় আনমনা বলে উঠলেন—কোর্ট কারো ইমোশন দেখে না। কোর্ট চায় প্রমাণ।

গাড়ি এসে শিরিনের বাড়িতে দাঁড়াল। দরজা খোলা হল। ভেতরে ঢুকলাম আমরা। সাদিক বললেন—আমরা চলে যাব, শিরিন। তোমরা দুজনে মিলে সাজিয়ে-গুছিয়ে নাও। পরে কথা হবে। মিনু, তুমি এখানেই থাকো। বিকালে যেও। আমি বিকালে এসে তোমার সাথে কথা বলব। চলো কুন্তল, আমরা যাই। কুন্তল আর সাদিক চলে গেলেন। ঘর গোছানোই ছিল। বাক্সপেঁটরা থেকে কিছু কাপড়-চোপড় বার করে আলনায় রেখে ফ্যানের হাওয়া ছেড়ে বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেলেন শিরিন। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে একসময় চোখ খুলে ফ্যানের ঘুরন্ত পাখার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে উঠে কুঁজোয় রাখা বাসি জল খেলেন। এবং পরে বাক্স থেকে একখানা ডাইরি বার করে আমায় এগিয়ে দিয়ে বললেন—পড়ো। দিন বিশেক হল, এই ডাইরি আমি আবিষ্কার করেছি। ডাইরিতে সাদিক লিখেছেন:

কোনো-কোনো ছেলের বিবাহিত রমণীর দিকে আকর্ষণ হয় বেশি। বিবাহিতার দেহ এবং মন দুইই খুব ভেতর থেকে টানে। আমি নিজেকে বারবার এই পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন এমন হয়, কখনও বুঝতে পারি নি। বারবারই এই মনে হয়েছে, দেহের রহস্যে বিয়ে-হওয়া মেয়েরা কুমারীদের চেয়ে বেশি ভরন্ত, বেশি গভীর। কুমারী মেয়েরা নিজের শরীর-কেই ভালোমতো চেনে না। চেনে না বলেই দেহের ভাষা ব্যবহার হয় না তেমন যুৎ-জাত ও সূক্ষ্ম রহস্য-লীন। ফলে তাদের মনের মধ্যে থাকে না কোনো সমুদ্র। সেই মন বড়ো জোর একটি লেজ-নাচানো ক্ষুদ্র পাখি। টি-টি। তাই আমি শিরিনকে দুঃসহ ভালোবাসায় উত্তেজিত করতে চেয়েছি ক্রমশ। এর বেশি এই ভালোবাসায় কিছুই ছিল না। নইলে একটি গ্রাম্য মেয়ে আমায় টানবে কেন? তার অসহায় দুটি চোখের চেয়ে অসহায় শরীরখানি আমার বেশি ভালো লাগত। ভয় হয়, যদি একদিন এই শরীর আমার আর ভালো না লাগে! কোনো অবস্থায় এই দেহ যদি আর অসহায় না থাকে, আমি সেদিনও কি ঐ দেহে রহস্য খুঁজে পাব?

পড়তে-পড়তে আমি বার বার চমকে উঠছিলাম। মাথার মধ্যে সব উলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। আমি মাসির দিকে চেয়ে দেখলাম, মাসি আমার মুখ-পানে দুটি অসহায় বড়ো-বড়ো চোখ মেলে নিষ্পলক চেয়ে আছেন। ভালোমতন করে তাঁর চোখে চাইতেই উনি গাঢ় স্বরে কেঁপে-কেঁপে উঠলেন—পুরুষের এই মন নিয়ে আমি কী করব বলে দে, মিনু। তুই বলে দে। বলতে-বলতে মাসি বিছানায় ভেঙে পড়লেন। দুহাতে খামচে ধরলেন বিছানার চাদর। উপুড় হয়ে বুকের সাথে কী যেন আঁকড়ে ধরতে গিয়ে পারলেন না। মাথার চুল বিপর্যস্ত হয়ে সামনে ঝুলে পড়ল। চোখে শুকনো কান্নায় খিন্ন কালিমার ছাপ ভিজে উঠছে মাত্র কোনোমতে। কণ্ঠস্বরে কী কষ্ট ঝরছে, কী নিষ্ঠুর চাপা খেদ ঘুলিয়ে উঠছে, বোঝাতে পারব না। পাগলের মতন বলছেন:

আহা রে ছুলছুলি ঘোড়া
জোর করো থোড়া থোড়া
যেতে হবে টুঙ্গির শহর।

বারো

আমি সাদিকের জন্য বিকাল অবধি অপেক্ষা করি নি। চলে এসেছিলাম। সারা রাত ছটফট করেছি। আমার কষ্ট দেখে মা এসে বিছানার কিনারে বসে ছিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বারবার শুধিয়ে ছিলেন—কী হয়েছে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারি নি। আমার অবস্থা দেখে মায়ের চোখে মুখে আশ্চর্য অপরাধের ছাপ জেগে উঠেছিল। এই ভাবে একটা-একটা দিন কেটে গেল। আগামী কাল রায় বেরুবে আদালতে। আজ এই বাড়িতে আমি একা হয়ে যাব। মা চলে যাবেন গাঁয়ের বাড়ি। বাবাও তৈরি হচ্ছেন মাকে ট্রেনে তুলে দেবেন, তাই। দাড়িতে আতর মাখছেন। কৌটোয় পান সাজিয়ে নিচ্ছেন। চোখে খুশির উজ্জ্বল স্রোত হাওয়ার মতন কাঁপছে। আমি দিনের বেলায় দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলাম। দেখছিলাম, আমি একটা ছোট্ট টি-টি পাখি আকাশপথে একলা উড়ে যাচ্ছি। অবধিহীন আকাশের পথে আমি বড়ো একা। আমি চিৎকার করে ডেকে যাচ্ছি মানুষকে। ঘুমন্ত নগরী, গাছপালা-প্রান্তর ঘুমিয়ে। কেউ আমার কান্না শুনছে না। বুকের তলায় বুদবুদ করছে ভয়। প্রবল এক ভয়ের তাড়নায় বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। ভয়েই কেঁদে উঠে জাগলাম। বিকাল হয়ে এসেছিল। হঠাৎ কী মনে করে চোখে মুখে জল দিয়ে চা খেয়ে শাড়ি বদলে বাইরে পথে একলা হাঁটতে শুরু করলাম। মা জানালেন, চলে যাবেন উনি। বাপ-মেয়ে একসাথে থেকো বলে ভালো থাকার শুভেচ্ছা জানালেন। মায়ের চেহারা কী করুণ দেখাচ্ছিল, মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। বারবার আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। পেছনে চেয়ে দেখলাম, মায়েরা রিকশা করে স্টেশনের দিকে চলে গেলেন। রাজা আমার নাম ধরে মিনুআপা বলে। রাজা আমায় ডেকে-ডেকে কী বলছিল রিকশায় চড়ে, শুনতে পেলাম না।......

শিরিনের ঘরে গিয়ে উঠলাম। শিরিন দরজা খুলে আমায় ভেতরে ডেকে নিলেন। সন্ধ্যার সময় মনে করলাম, আমি এখানেই থেকে যাব। সেকথা মাসিকে জানালামও। মাসি খুশিই হলেন। সন্ধ্যার আরো কিছু পরে সাদিক এলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে শুধালেন—আমার কথা তো তুমি শুনলে না, মিনু।

বললাম—আপনার সব কথা আমি জানি।

—সব জান ? কোথা থেকে ? কে বলেছে ? আমি তো তোমায় যা বলব বলেছিলাম, শুনলে না, না শুনেই কী করে জানলে আমার সব কথা ?

—আপনার ডাইরি পড়েছি সাদিক-মামা।

—ও !

মামা ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন। আমি ওঁর পিছু-পিছু এগিয়ে এলাম বারান্দায়। সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। মামা কয়েক ধাপ নীচে নেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—ওসব কথা আমি নিজের ওপর রাগ করে খুব এক ইমোশনাল সময়ে লিখেছি, মিন্টু। বিশ্বাস করো, আমি যা লিখেছি সেসব আমার মনের কথা নয়। শিরিন কখন ওই ডাইরি চুরি করে নেয় জানতে পারি নি। আরো দু ধাপ নামলেন মামা। আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন—একটি জটিল নারী-জীবনে আমার আকর্ষণ ঠিক কথা। কিন্তু দেহই আমার কাছে সব ছিল না। তুমি শিরিনকে বলবে। বলবে তো ?

দৃঢ় গলায় বললাম—না। কখনও নয়। কক্‌খনও নয়। কিছুতেই না। আমি অত গ্রাম্য নই। তুচ্ছ একটা টি-টি পাখি নই সাদিক-মামা।

—তাই বুঝি ?

বলে সাদিকুল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছিলেন। পেছনে, আমার পেছনে এসে মাসি দাঁড়িয়েছেন। সাদিকুল আর উঠলেন না। হো হো করে হেসে উঠে ঘুরে গেলেন। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে গেলেন। মাসিও পেছন থেকে সরে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমার সহসা দুই চোখে কান্না এসে দুলতে লাগল। কিছু পর বাইরে বাবার কড়া গলা শোনা গেল। মিন্টু, নেমে আয়। একলা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। মাসি এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আকুল হয়ে বললেন—যেও না, মিন্টু। একলা আমার ভয় করছে।

আমার উপায় ছিল না। বাবার হুকুম। চলে গেলাম নেমে। বাড়িতে এসে খেয়ে নিয়ে বালিশে মাথা দিতে গিয়ে দেখি তলায় চিঠি। মায়ের লেখা। মাসিকে।

স্নেহের শিরিন /

আদালতে আমি ভুল সাক্ষ্য দিয়েছি, বোন। আমি স্পষ্ট তালাক দিতে শুনেছি হাজী সাহেবকে। আমাকে ক্ষমা করে দিও। তুমি কখনও এই সংসারে ফিরতে চেও না। সাদিকুলকে শাদি করে সুখী হওয়ার চেষ্টা করবে। আমার আশীর্বাদ রইল। সাদিক ভালো ছেলে। ঘরের বউদের সে কেবল ভালোই বাসে নি। শ্রদ্ধাও করেছে। এই চিঠি যদি তোমার কোন ব্যবহারে লাগে, লাগিও। আমার স্নেহ জেনো। ইতি

তোমার বড়ো বোন

কুলসম

সেই এক মারাত্মক চিঠি এখন আমার ব্যাগের মধ্যে। সারারাত ছটফট করেছি এক দিশাহীন উত্তেজনায়। রাত গভীর হয়েছিল। পথে ভয়ে নামতে পারি নি। ভোরের জন্য অপেক্ষা করেছি। অনেক রাতে হঠাৎ দেখেছি, বাবা বিছানায় নেই। সারারাত তোলপাড় হয়েছে আমার। বাবা কোথায় গেলেন ?

অন্ধকার থাকতেই বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে পথে নেমে এসেছি। বুকটা আমার অসম্ভব আনন্দে টনটন করছে। রিকশা এখনও ঠিকমতন পথে নামেনি। পায়ে হেঁটে ছুটছিলাম। চৌমাথায় গেলে রিকশা পাওয়া যেত। এতক্ষণে খেয়াল হল। আমি এবার মাঠে নামলাম। আকাশে লালিমা ঈষৎ ফুটেছে। মামার দরজায় টোকা দিলাম। ঘরে হ্যারিকেনের আলোয় মামা পোশাক পরে তৈরি। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। অন্য হাতে অ্যাটাচি। আমায় এখন এই অবস্থায় দেখে আশ্চর্য হলেন। কী ব্যাপার, তুমি ?

—বলছি। আগে আমার সাথে খালামার ওখানে চলুন। ওখানে গিয়ে সব বলব। উত্তেজনায় কথা বলতে গিয়ে আমি বোধহয় মৃদু-মৃদু হাঁপাচ্ছিলাম।

মামা বললেন—আমি তো আজ পাটনা চলে যাচ্ছি, মিন্টু। পার্টি আমাকে পাটনা পাঠিয়ে দিচ্ছে।

আমি যেতে চাই নি। আমি নিজেকেই ঠিক চিনতে পারলাম না।

—আপনি খালামাকে ফেলে চলে যাবেন ?

—তোমার খালামা যাবেন কী করে, মিন্টু ? পথ যে বন্ধ হয়ে গেল !

রিকশা এসে গেল দ্রুত। পরে রাস্তায় আমরা রিকশা পেয়েছিলাম, মারাত্মক চিঠিটা এখন আমার হাতের মুঠোয়।

আমরা উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত। দরজা বন্ধ। কলিং বেল বাজল। একটু বাদে দরজা খুলে গেল। সামনে বাবা দাঁড়িয়ে। হাতে গোঁফ ছাঁটার কাঁচি। আমাদের দেখে ভেতরে পাশের ঘরে চলে গেলেন। খাটে শিরিন। সেদিকে চেয়েই বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। পরনের কাপড় একপায়ে হাঁটু অব্দি উঠে আছে। বুকের ব্লাউজ মেঝেয় পড়ে। ছেঁড়া। বুকের ওপর গলার কাছে কাপড় জড়ো করা। গলায় ছেঁড়া দাগ। গাল নখরে বিক্ষত। ঘুমন্ত কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বোধহয় চোখ তোলারও ক্ষমতা নেই। একটু পর কাতর খুব অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল গলা থেকে। সাদিকুল একটু ঝুঁকলেন। আমিও আরো কাছে এগিয়ে এলাম।

ডাকলাম—খালামা !

কোনো সাড়া পেলাম না। পায়ের দিকে একটু সরে যেতেই খালামা মৃদু নাড়া খেলেন নিজেরই মধ্যে। আমি সাদিকুলের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, তাবৎ মুখ কেমন সংকুচিত, রেখাময়। থুতনি ঝুলে গেছে।

বাবা এসে হঠাৎ পায়ের কাপড় টেনে নামালেন। কোনো কথা বললেন না। আবার পাশের ঘরে গেলেন, আবার এলেন। আমাকে বললেন—আজই আমরা বিকালে বাড়ি চলে যাব। তোমার ছোটোমাকে নিয়ে একসাথে যেতে হবে। তুমি এখন এখানেই থাকো। আবার চলে গেলেন পাশের ঘরে। আমি সেই মারাত্মক চিঠিখানি হাতের মুঠোয় ধরে আছি। সাদিকুল ডাকলেন অস্পষ্ট গলায়—শিরিন ! আর একবার ! আর একবার তুমি পালিয়ে আসতে পার না ?

খালামা চোখ তোলার চেষ্টা করতেই চোখের পাতা থরথর করে কেঁপে গেল। সাদিকুল একটা ঢোঁক গিললেন। তারপর কোনো কথা না বলে সহসা তীরের মতন বেগে ঘর ছেড়ে সিঁড়ি টপকে নেমে গিয়ে রাস্তায় পড়লেন। রিকশায় উঠে পড়লেন। আমি চিৎকার করে সাদিকমামাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, গলায় কোন শব্দ ফুটছে না। আমার হাতের মুঠোয় সেই মারাত্মক চিঠি নিঃশব্দে পড়ে রইল প্রতিবাদহীন।

তেরো

সেই থেকে শিরিন-মাসি বিছানায় শুয়ে থাকেন দিনরাত্রির অধিকাংশ মুহূর্ত। তাঁর মনের মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ আছড়ে পড়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতন। কিন্তু বাইরে সেই ক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের কোনো পরিচয় ফুটে ওঠে না। শুধু চিন্তারই কিছু ক্ষয় তাঁকে তলে-তলে পিষে ফেলে মানুষের একটি প্রায় সমাহিত আকৃতির মধ্যে জগৎ থেকে নির্বাসিত করে দেয়। একটি রক্তাক্ত জীবনপিণ্ড স্থবির হয়ে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে চোখের ওপর, পৃথিবীর হিম-অন্ত্র থেকে একটি মৌন ম্লান ছায়া উঠে এসে তাঁর দেহের চারপাশে জড়িয়ে দেয় এক আশ্চর্য আবরণ। মাসিকে আমি নিজেও যেন ঠিক আর চিনতে পারি না।

মাসির শরীরের নিম্নভাগ অবশ হয়ে এলিয়ে গেছে। হাঁটাচলা করতে গেলে তাবৎ প্রত্যঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠে। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত মাসি দেওয়াল আঁকড়ে পা টেনে-টেনে চলবার চেষ্টা করেন। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে পারেন না। হাত কেঁপে গেলাস খসে যায়। জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। রাজা কাছে এলে সহ্য করতে পারেন না।

কোলে উঠতে চাইলে, গায়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও সিঁদুরি গাছে এ বছর অজস্র বউল পুঞ্জিত হয়ে ওঠে।

গোলোকবাবু নল উঁচিয়ে পাম্প মেশিনে মেডিসিন স্প্রে করতে থাকেন। পুঞ্জে-পুঞ্জে অসংখ্য মৌমাছি গুঞ্জন করে। আঠালো মধু ঝরে পড়ে ডালে পাতায়, সবুজ গন্ধে ম-ম করে বাগান। নির্মম সেই সৌন্দর্য মাসি কি সহ্য করতে পারেন? জানালা খুলে দিয়ে মাসিকে দেখানোর চেষ্টা করি—খালামা! কত বউল এসেছে দেখো। একদিন তুমি প্রার্থনা করেছিলে।

অন্ধকার-গোপন পৃথিবীতে মাসির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। মাসি টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। দেওয়াল ধরে ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে এসে সেই রাতে পায়ে-পায়ে এগোবার চেষ্টা করেন। ক্রুদ্ধ মিয়ানো গলায় শিরিনের রাতভর এক আশ্চর্য যুদ্ধ চলতে থাকে।

আমরা কেউ কিছুই বুঝি নি। দারুণ নিস্তরঙ্গ মাসি মনে-মনে কী দুঃসহ আরচণ করেছেন নিজেরই সাথে। এভাবে উঠে দাঁড়ানো যদিও তাঁর স্বাস্থ্য ও শক্তি বিরুদ্ধ, তবু তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাঁটতে পারেন না, তবু হেঁটে এসেছেন সারা ঘর, তাবৎ বারান্দা, সিঁড়ি এবং বাগানের চিকন পথ। তারপর হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। মাথা তুলতে পারেন নি। আমি ওঁর ঘরে গিয়ে তিনি নেই দেখে মাকে ডেকেছি। আব্বা উঠেছেন। খুঁজতে-খুঁজতে বাগানে এসেছি আমরা। দেখি, মাসি মুখ থুবড়ে মাটিতে শুয়ে, চোখে মুখে ধুলো, চুলে লুটিয়ে থাকা ধুলোর ছোপ। মাসি চোখ তুলে আমাদের দিকে পাগলের মতন চাইলেন। ভোর হচ্ছে তখন। রোদের রেখায় পুব-আকাশ ফরসা হচ্ছে। মাসি আমাদের কারুকেই ঠিক যেন আর চিনতে পারছেন না।

হাতে ধরে আছেন সেই চিঠির মারাত্মক টুকরোখানি। এবং তিনি সারারাত যা-যা করেছেন, তারও স্পষ্ট মানে তাঁর জানা নেই। তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক এই সকালে আস্তে-আস্তে ফের ঘুমিয়ে গেল। এইভাবে তাঁর সব সত্তা হঠাৎ করে ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাবা ওঁকে কোলে তুলে পাঁজা করে খাটে এনে ফেললেন। মাসি আর চোখ তুললেন না।

তাঁর সেই শ্রান্ত শরীরে, ঘুম-মাখানো অবয়বে পৃথিবীর সবচেয়ে কুটিল ক্রুর অভিশাপ তলপেটে দাপিয়ে নড়ে উঠল; যার সাথে শিরিন মনের সব সংযোগ হারিয়ে এখনও বেঁচে রইলেন, পাগল হতে চেয়েও পারলেন না। এবং মৃত্যুও তাঁর এই শরীরের পক্ষে অনুচিত। সেই ক্ষমতাও হারিয়েছেন শিরিন।

কেবল সিঁদুরি গাছ পৃথিবী আলো করে হাসছে। চোখের সামনে। জানালার ওপারে জীবনের বিপরীত সৌন্দর্য এক হয়ে মিশে গেছে।

আধুনিক বাঙলা চিত্রশিল্প আর গ্রাফিক আর্টস

সূচনা ও কিছু সমস্যার কথা

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

পশ্চিমি আঙ্গিকে ছবি আঁকা আর আধুনিক গ্রাফিক আর্টস আমাদের দেশে শুরু হয় আঠার শ শতাব্দীর শেষ দিকে। পশ্চিমি আঙ্গিকে ছবি আঁকা বলতে আমি আমাদের চিরাচরিত গুয়াস আর টেম্পেরা ছাড়া ক্যানভাসের ওপর তেলরঙা ছবির কথা বলছি। আধুনিক ধরনের গ্রাফিক আর্টস বলতে অন্য দেশের সনাতনী কাঠখোদাই আর নানান রকমের খোদাই ছাড়া লিথোগ্রাফিও বোঝাচ্ছি, যা করা হয় মানুষের হাত আর যন্ত্র দুইয়ের সাহায্যে। এইসব শিল্প আমরা শিখেছি ব্রিটিশদের মারফত যাঁদের মধ্যে শৌখিন আর পেশাদার পর্যটক আর এদেশের বাসিন্দা সাহেব-শিল্পীরা সকলেই ছিলেন।

১৭৮৯ সনে সুবিখ্যাত কাকা-ভাইপোর জুড়ি টমাস আর উইলিয়াম ড্যানিয়েল কলকাতা থেকে তাঁদের 'টুয়েলভ ভিউজ অব ক্যালকাটা' প্রথম ছাপান। এর ছবিগুলির খোদাই আর ছাপানোর কাজে তাঁরা ভারতীয় কারিগরদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁদের সাহায্য নেন। এর বছর দশ পরে বেলজিয়ান শিল্পী বাল্থাজার্ড সল্ভিন্স্ এইভাবে ভারতীয় সহকারীদের সাহায্যে বিশাল রঙিন এনগ্রেভিংস-এর বই 'দ্য কসটিউম্স্, ক্যারেকটার্স্ অ্যানড সীন্স্ অব হিন্দোস্টান' কলকাতা থেকে ছাপিয়ে বার করেন।

এইসব কারিগররা ছাড়া অনেক দিশি হিন্দু আর মুসলমান পটুয়া কলকাতার বাসিন্দা গুণী শৌখিন শিল্পীদের কাছে থেকে খাঁটি জলরঙে আঁকা শিখতে লাগলেন। এইসব পোটোরা আগে টেমপেরার রঙে জড়ানো পট আঁকতেন। জলরঙে আঁকা শিখে তাঁরা সাহেব বিবি-পসন্দ নানান ধরনের ছবি ইংরেজদের বরাত অনুযায়ী বা নিজেরা কাগজের ওপর এঁকে বিক্রি করতে শুরু করেন। এঁরা যে কত রকমের ছবি আঁকতেন তার ইয়ত্তা নেই; গাছ-গাছড়া-ফুল-ফলের ছবি, জন্তু-জানোয়ার-পাখির ছবি, সাহেবদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের বাড়িঘরদোর, গাড়িঘোড়া, পোষা কুকুর ইত্যাদির ছবি আর নানান ধরনের ভারতীয় চরিত্র,

তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের নানান পেশা, কারুশিল্প, উৎসব ইত্যাদির ছবি। শ্রীমতী মিল্‌ড্রেড আরচার দিশি শিল্পীদের আঁকা এইসব ছবির 'কোমপোনি পেনটিংস' নাম দিয়েছেন। এই ধরনের চমৎকার-ছবির বহু নমুনা দিশি-বিদেশী মিউজিয়ামে রয়েছে যার মধ্যে প্রধান দুটি হল কলকাতার ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল হল আর লনডনের ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি। যদিও দিশি শিল্পীরা সাহেববিবিদের আওতায় এই ছবিগুলি জলরঙা আঙ্গিকে আঁকেন, তবুও মজার ব্যাপার হল, এই ছবিগুলোর চেহারায় একটা ভারতীয়ত্ব স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। অর্থাৎ আঙ্গিকে বিদেশী হলে কী হবে, মেজাজে শিল্পীরা ছবিগুলোকে দিশি করে দিয়েছিলেন।

'কোমপানি পেনটিংস'-এর পর বিদেশী আঙ্গিক আর দিশি দক্ষতার আর দৃষ্টিভঙ্গির খুব চমৎকার খাপ-খাওয়ানো ভাব আমরা দেখতে পাই কালীঘাট পট আর কালীঘাট পটের ঢঙে আঁকা ছবিতে। কাগজের ওপর জলরঙ দিয়ে আঁকা কালীঘাটের পট ১৮৩০ নাগাদ শুরু হয়ে গত শতাব্দীর শেষ অবধি খুব দাপটের সঙ্গে বাজার জমিয়ে রেখে তারপর আস্তে-আস্তে হারিয়ে যায়। কালীঘাট পটের এই পতনের মূলে নানান কারণ ছিল যা নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনার দরকার নেই।

এটা একটা জানা কথা যে মানুষ যখন কোনো বিদেশী শিল্প-আঙ্গিক বা নতুন ভাষা শেখে তখন এই শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় খানিকটা অজ্ঞাতসারে তার মনোভাবও বেশ কিছু বদলে যায়। কালীঘাটের পট এর একটি চমৎকার উদাহরণ। সব তীর্থস্থান বা মন্দির-সংলগ্ন শিল্পের মতন কালীঘাট পটেরও শুরু হয় দেবদেবী পৌরাণিক ইত্যাদি ছবি দিয়ে। কিন্তু কালীঘাটের শিল্পীরা ধর্মীয় ছবি ছাড়া নানা ধরনের সামাজিক ছবিও আঁকতে আরম্ভ করেন। এই যে ধর্মীয় বিষয়বস্তু থেকে সামাজিক বিষয়বস্তুতে ছড়িয়ে পড়া—এই ব্যাপারটা আর অন্য কোনো তীর্থক্ষেত্রের শিল্পে দেখা যায় নি; যেমন পুরী, তিরুচিরাপল্লী বা অন্য কোনো জায়গায় ঘটতে দেখা যায় নি। কালীঘাটের সামাজিক পটগুলোর মধ্যে একটা মূল ব্যাপার ছিল গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের কলকাতার নিষ্কর্মার ধাড়ি বাবু আর বিবিদের জীবনকে ব্যঙ্গ করে রসিয়ে দেখানো। এ ছাড়াও শহর-জমানো হুজুগ আর হৈ-চৈ-ফেলা নানারকমের কাণ্ড নিয়েও পোটোরা অনেক ছবি আঁকতেন। যেমন ১৮৭০-এর দশকের শুরুতে এলোকেশী আর তারকেশ্বর মোহান্তর মামলা, এর কিছুকাল পরেরাম চাটুজ্জের মেয়ের বেলুনে ওঠা নিয়ে বেলুনে বাঙালি বিধি। তারও পরে বাঙালির সারকাসের ছবি। কালীঘাটের পটুয়ারা সাহেবদের জীবনে নানান দিক নিয়ে, আর তাঁদের পছন্দমত ছবি এঁকেছিলেন—যেমন ঘোড়দৌড়, বাঘশিকার, জন্তু-জানোয়ার-পাখি-সরীসৃপ ইত্যাদির ছবি।

কলকাতায় একদিকে যখন এইসব ঘটছে অন্যদিকে গ্রাফিক আর্টসের ক্ষেত্রেও নতুন-নতুন কাজ শুরু হয়ে যায়। কাপড়ের ওপর কাঠখোদাই দিয়ে ছাপা আমাদের দেশে শ-শ বছরের পুরোনো। কিন্তু কাগজে কাঠখোদাইয়ে ছাপার প্রথম বাঙলা নমুনা হল ফেরিস কোমপানির ১৮১৬ সনে ছাপা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"। অনেকেরই বিশ্বাস, এই বইয়েব ছটা ছবির মধ্যে অন্তত তিনটি নিঃসন্দেহে কাঠখোদাই। এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন রামচাঁদ রায়। এর পরেই কলকাতার কাঠখোদাই-শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে রেভারেনড লসনের "সচিত্র পশ্বাবলী"। তবে বইয়ের সীমা ছাড়িয়ে কাঠখোদাইয়ের আসল রূপ প্রকাশ পায় কয়েক দশক পরে। আমি আলাদা-আলাদা ছাপা বড়ো-বড়ো কাগজে হাতে-রঙ-দেওয়া রঙিন কাঠখোদাইয়ের কথা বলছি, যা ইচ্ছে করলে বাঁধিয়ে রাখা যেত। এই জোরদার টানটান কাঠখোদাইগুলির অধিকাংশেরই কালীঘাট পটের বিষয়বস্তু নিয়ে ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সনের মধ্যে আঁকা। বিষয়বস্তু ছাড়া

অনেক কাঠখোদাই কালীঘাটের পটের প্রায় হুবহু অনুকরণ করে খোদাই করা হত।

লিথোগ্রাফি বা পাথরের ওপর উলটো করে এঁকে তা থেকে ছবি ছাপানোর কায়দা উদ্ভাবন করেন আলোয়াস সেন্‌ফেল্‌ডার বলে একজন ব্যাভেরিয়ান শিল্পী ১৭৯৩ সনে। পশ্চিমি এই আনকোরা নতুন কায়দায় কলকাতায় প্রথম ছবি ছাপেন ১৮২২ সনে দুজন ফরাসি শিল্পী: বেলনস আর দ্য সাভিনাক। ১৮২৫ সনের পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, একটি বাঙালি "পাথুরিয়া কারখানা" দেবদেবী, মানচিত্র ইত্যাদি ছেপে বিক্রি করছেন। কলকাতায় লিথোগ্রাফির আসল জয়জয়কার হয় যখন ১৮৭০-এর দশকে বিখ্যাত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী আর তাঁর চারজন বন্ধু মিলে বউবাজার ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর পত্তন করেন। এঁরাই ১৮৭৮ সনে পুনের রবি বর্মা লিথোগ্রাফিক প্রেসের দু বছর আগে এদেশে রঙিন লিথোগ্রাফ ছাপা শুরু করেন। এঁদের পর কলকাতার লিথোগ্রাফিক ছাপার নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল কাঁসারিপাড়া আর্ট স্টুডিও, শাঁখারিপাড়া আর্ট স্টুডিও, পি. সি. বিশ্বাস অ্যানড কোং, চণ্ডীচরণ ঘোষের আর্ট চিত্রালয় ইত্যাদি।

এইবার আমি কলকাতায় তেলরঙা ছবির কথায় আসছি। কলকাতায় এইভাবে নিঃশব্দে প্রায় সাধারণের চোখের বাইরে ক্যানভাসের ওপর তেলরঙা কাজ ১৮৪০-৫০ নাগাদ শুরু হয়ে যায়। নাম-না-জানা, স্থানীয় বাঙালি শিল্পীরা তেলরঙে বড়ো-বড়ো করে ঝলমলে রঙিন অসাধারণ সুন্দর শিব, পার্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর আর পুরাণের রামায়ণ-মহাভারতের নানান ঘটনাবলীর ছবি এঁকে চলতে লাগলেন বিশেষ করে বড়োলোক আর জমিদারদের বাড়ি, ঠাকুরদালান, মন্দির ইত্যাদির জন্য। এঁদেরই সমসাময়িক রাজা রবি বর্মার তৈলচিত্রগুলো কিছু পরে লাখ-লাখ লিথোগ্রাফের মারফত সারা ভারতে হিন্দু-বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কলকাতায় এই শিল্পীদের কাজগুলোর খোঁজ আজও আমরা বেশির-ভাগ বাঙালি জানি না, কারণ এঁদের নিয়ে বিশেষ লেখালেখি হয় নি, এঁদের ছবিও ছাপা হয় নি। কিছু অতি-উৎসাহী শিল্পরসিক এগুলিকে প্রায়ই "ডাচ বেঙ্গল স্কুলে"র কাজ বলে বর্ণনা করেন। কেন, তার অবশ্য কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া, ওলন্দাজদের টানতে গেলে ছবিগুলোর সন-তারিখ কোথায় পিছিয়ে নিয়ে যেতে হয়, সেটা এঁরা ভেবে দেখেন না। সে যাই হোক, কি সোনালি আর নানান ঝলমলে রঙের বাহারে, কি আঁকার কায়দায়—সব দিক দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর ছবিগুলো বাঙালির গর্বের বিষয়। পশ্চিমি আঙ্গিক আর দিশি মন এই ছবিগুলিতে একাকার হয়ে বিশিষ্ট বাঙালি চরিত্র এনে দিয়েছে।

তেলরঙা ছবির কথা ছেড়ে এবার সবার আগে আমি আর-এক ধরনের ছবির কথা বলব, যা উত্তর কলকাতায় গত শতাব্দীর শেষে কিছু দিনের জন্য দেখা গিয়েছিল। আমি সেই কাঁচের ওপর তেলরঙে আঁকা রঙিন ছবির কথা বলছি যার কিছু-কিছু এখনও বাগবাজারের নন্দলাল আর পশুপতি বোসদের রাজবাড়ির মতো বাড়ির দরজা আর জানালার কাঁচের ওপর দেখা যায়। শোনা যায়, এইসব দেবদেবীর, বিশেষ করে কালী আর দশাবতার ইত্যাদির, ছবিগুলো দেখতে বলরাম বসুর বাড়িতে থাকবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ পশুপতি আর নন্দলাল বোসের বাড়ি যান। লেখায় এই কাঁচের ছবিগুলির নাম করছি এই কারণে যে, এই বিদেশী ছবি আঁকার কায়দা বাঙালি শিল্পীরা হাড়মাস করে নিয়েছিলেন। এর রঙের জৌলুস আর আঁকার সূক্ষ্ম কারিগরি দেখলে রাজস্থানি মিনিয়েচারের কথা মনে পড়ে যায়।

বাঙলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার সূচনা আর বিবর্তনের এই ছোটো বিবরণে এইবার একটা বড়ো ঘটনার কথায় আসি। ঘটনাটা আসলে দুটো ঘটনা। প্রথমটা হল ১৮৫৪ সনে ইংরেজদের আওতায় 'স্কুল

অব ইনড্রাসট্রিয়াল আর্টস' আর ১৮৬১ সনে 'গভর্ন্মেন্ট্ স্কুল অব আর্ট" এ-র পত্তন। এই ধরনের ইস্কুল চালু করার উদ্দেশ্যটা কী ছিল তা বোঝাতে আমি ১৮৭৬-৭৭ সনের ডিরেকটর অব পাবলিক ইনসট্রাকশনের রিপোর্ট থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"The object of the institution (The Government School of Art) is to give the native youth an idea of men and things in Europe, both present and past, not that they might learn to produce feeble imitations of European art, but rather that they might study European methods of imitations and apply them to the representation of natural scenery, architectural monuments, ethnic varieties and natural customs of their own country.'

ওপরের কথাগুলোর ভিত্তিতে আমি এখন যাচাই করে দেখতে চাই, সরকারি আর্ট স্কুল প্রথম পনেরো বছরে এই উদ্দেশ্যগুলো কতখানি সফল করতে পেরেছিল। আমার হাতের কাছে যে বইপত্তর রয়েছে সেগুলোর থেকে ইস্কুলের ছেলেদের ছবি আঁকার কেরামতির বহরটা মেপে ওঠা যায় না। ১৯৬১-তে ছাপা গভর্ন্মেন্ট্ স্কুল অব আর্টের শতবার্ষিকী বইটি থেকে জানা যায়, ১৮৭৯ সনে ইস্কুলের ছাত্রদের কাজের দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয়। তাতে চোদ্দ জন তখনকার আর আগেকার ছাত্রদের ছেষট্টিটি কাজ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এই ছেষট্টিটির মধ্যে কতকগুলো পেনটিং ছিল, সে পেনটিংগুলোর উৎকর্ষ কী জাতের ছিল, এসব সম্বন্ধে কিছুই টের পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, গ্রাফিক আর্টের ক্ষেত্রে ইস্কুলের ছাত্ররা বেশ চৌকশ হয়ে উঠেছিল। যেমন আমরা জানতে পারি, একটি এগজিবিশন কমিটি ১৮৭১-এ লনডনের কেনসিংটনে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা বেশ কিছু কালিকলমে আঁকা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নানান দিক নিয়ে স্কেচ পাঠান। এই স্কেচগুলোর বিলেতে খুব সুখ্যাতি হয়। এগুলি পরে লিথোগ্রাফি মারফত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুবিখ্যাত 'অ্যানটিকুইটিজ অব ওড়িশা' বইতে ছাপা হয়। লিথোগ্রাফিতে বিশেষ করে ছাত্ররা খুব ওস্তাদ হয়ে ওঠেন। পূর্বোক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ছাড়া নবকুমার বিশ্বাস, শশিভূষণ শ্রীমানী, গোপালচন্দ্র পাল, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশচন্দ্র খাঁ আর কয়েকজন লিথোগ্রাফি-শিল্পে খুব নাম কেনেন। তখনকার দিনের সাহেবসুবোদের লেখা বড়ো-বড়ো প্রকৃতিবিজ্ঞান আর উদ্ভিদবিজ্ঞান বইতে এঁদের ছবি খুব ব্যবহৃত হত। এই ধরনের একটি বিখ্যাত আর বিশাল আকারের বই স্যার জোসেফ ফ্রেয়ারের (১৮৭২) 'থানাটোপিডিয়া অব ইনডিয়া' বলে অন্নদাপ্রসাদ আর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অসামান্য সব ছবি আছে।

১৯শ শতকের শেষার্ধের ছবি আঁকার জগতের ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে শিল্পীদের মধ্যে যাঁর চেহারা পাথরে কোঁদা মূর্তির মতন স্পষ্ট, তিনি হলেন শশী হেস। প্রথমে কলকাতায় কিছুদিন আঁকা শিখে হেস ইতালিতে পশ্চিমি ঢঙে অঙ্কনবিদ্যা রপ্ত করতে যান। শশী হেস বোধহয় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ন্যুড বা নগ্নাকৃতি আঁকেন। তিনি প্রতিকৃতিও আঁকতেন, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবিটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় এখনও হেসের যেসব ছবি দেখা যায় তার মধ্যে মারবেল প্যালেসে রাখা ছবিগুলো অন্যতম। এগুলো দেখলে বোঝা যায়, শশী হেস পশ্চিমি অ্যাকাদেমিক স্টাইলে কী ধরনের দক্ষতা লাভ করেছিলেন।

এইবার আমি উনিশ শতাব্দীর কলকাতার সামাজিক আর রাজনীতিক পটভূমিকার সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। বাঙলার নবজাগরণের মূল পত্তন করেন রাজা রামমোহন রায়, এবং উনিশ শতকের বাঙালি মহাপুরুষরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। এই নবজাগরণের ফলে আমাদের সামন্তযুগের অচলায়তনের ভিতে ফাটল ধরে, আর আমরা নতুন যুগের দিকে এগিয়ে যাই। তা ছাড়া এই আন্দোলনের দৌলতে আমাদের অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মীয় সংস্কার শুরু হয়—যা আমাদের ভাবনাচিন্তার জগতে বিপ্লব এনে দেয়। বিনয় সরকারের ভাষায় বলতে গেলে, বাঙালির মগজের ঘিলুকে কিলবিলিয়ে দেয় বিশেষ করে ১৮৫০-এর পর থেকে। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে নতুন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদের উদয় হল। তখন অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ওঠার অনেক অনেক যুগ বাকি। কিন্তু লোকেদের মনে জাতীয় ব্যক্তিত্ব জাহির করার ইচ্ছে দানা বাঁধছিল। তাঁরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমান অধিকার, আর দেশশাসনে ভারতীয়দের ন্যায্য পাওনার দাবি করছিলেন। এইসব জিনিসগুলো একত্র হয়ে দানা বেঁধে ১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় রূপ পায় এবং পরে এই শতাব্দীর গোড়ায় সহিংস জাতীয় আন্দোলনে ফেটে পড়ে।

ধর্মের জগতে ব্রাহ্মধর্ম সামাজিক চেতনায় অনেক ব্যাপারে সংকীর্ণতা কুসংস্কার কাটিয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি আনতে সক্ষম হয়। রামকৃষ্ণ এই সময়ে বিভিন্ন ধর্মের মূলগত ঐক্য অর্থাৎ "যত মত তত পথ" দিয়ে একই ভগবানে বিশ্বাস আর ভক্তির মধ্য দিয়ে সনাতনী হিন্দুধর্মে একটা প্রাণশক্তি আর উদারতার সঞ্চার করছিলেন। এর পর স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়ে ধর্মের মধ্যে জীবে প্রেম আর মানবসেবা, কাজ আর চিন্তার মধ্যে দিয়ে করে দেখিয়ে দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করেন।

এরপর আমরা শিল্প আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদেশী শিক্ষা আর প্রভাবের ফলে যেসব গভীর পরিবর্তন আসে সেগুলোর দিকে নজর দিই। যেমন আমাদের চিরাচরিত যাত্রা কলকাতায় অন্তত হটে গিয়ে পশ্চিমি থিয়েটারকে জায়গা দিতে বাধ্য হয়। আর সনাতনী পৌরাণিক, রামায়ণ-মহাভারত আর কৃষ্ণলীলার পালার জায়গায় সামাজিক, এমনকি রাজনীতিক নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু হয়ে যায়। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের বদলে উপন্যাস দিয়ে এদেশে প্রথম গল্প বলতে শুরু করেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-দর্শন, মানবতাবাদ ইত্যাদিতে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ আর জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত ভারতীয়দের একটা প্রধান সমস্যার বেশ সন্তোষজনক সুরাহা পাওয়া যায়। সেটা হল কী করে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অটুট রেখে বাইরের জগতের অসংখ্য প্রভাবগুলোর থেকে সজ্ঞানে প্রয়োজনীয় প্রভাবগুলোকে বেছে নিয়ে সেগুলোকে আত্মস্থ করে আরও উন্নত এবং মানসিক আর আন্তরিক দিক থেকে সমৃদ্ধতর মানুষ হওয়া যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ বিদেশী উপন্যাসের ফর্ম্ নিয়ে সেটাকে একেবারে দিশি ভাব দিয়ে বাঙলার সাহিত্যসৃজনশক্তির একটা অপরিহার্য 'সাহিত্যমাধ্যম' করে তুললেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনে দেখা যায়, সারা জীবন যা-কিছু বাঙালি, যা-কিছু দিশি, সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সবকিছু ভাঙার চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত বাঙলায় মহাকাব্য লিখে অমরত্ব পেলেন। গ্রীক কবি আর মিলটনের প্রভাবকে আশ্রয় করে তিনি যে মেঘনাদবধকাব্য রচনা করলেন তা পাশ্চাত্ত্য আর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব সমন্বয়।

শিল্পপ্রসঙ্গে এইসব কথা পাড়ার কারণ রয়েছে। সাহিত্যিক, সামাজিক আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে যে মানসিক দুঃসাহসী অভিযান, যে জাতীয় সত্তা খোঁজার প্রয়াস চোখে পড়ে, তার কোনো কিছুই ছবি-আঁকার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আমাদের শিল্পীদের মনে কোনো দ্বিধা, প্রশ্ন, সংশয় ছিল না, ছিল না বিদেশী প্রভাবকে

সজ্ঞানে গ্রহণ করে তাকে দিশি ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ খাওয়ানোর চেষ্টা। দু-একজন ছাড়া ছবি আঁকার ক্ষেত্রে পশ্চিমের 'হনুকরণ' শিল্পীদের একমাত্র উপজীব্য ছিল।

অঙ্কনশিল্পের এই অবস্থাতেই উনিশ শতক শেষ হয়ে আমাদের শতাব্দী শুরু হয়। আর আমার লেখাটা এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শেষ করবার আগে এই শতাব্দীতে বাঙালাদেশের চিত্রশিল্পের আর গ্রাফিক আর্টের কয়েকটা কথা ছুঁয়ে যেতে চাই। যেমন শিল্পচিন্তায়, ছবি আঁকায় অবনীন্দ্রনাথ আর হ্যাভেলের দান, গগনেন্দ্রনাথের শিল্পকীর্তি, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পের ঘড়ির কাঁটা ঘোরানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, যামিনী রায় আর নন্দলালের ভূমিকা, খাঁটি শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আর চল্লিশের দশকে প্রথম ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী ক্যালকাটা গ্রুপের অভ্যুদয়। গ্রাফিক আর্টসকে সমৃদ্ধ করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে নন্দলাল, রমেন চক্রবর্তী আর মুকুল দে-র নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

পরিশেষে যে কথাটার ওপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই তা হল, যে মূল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বঙ্কিম আর মাইকেলকে তাঁদের সময়ে লড়তে হয়েছিল, সেই সমস্যায় আরও জটিল আর গুরুতর রূপে পৃথিবীর সব দেশের সব ধরনের লেখক, শিল্পী আর সৃজনশীল ব্যক্তিদের এখনও লড়তে হচ্ছে। শিল্পীদের কাছে সেই সমস্যাটা হল প্রত্যেক শিল্পীর নিজের দেশের শিল্প-ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বাতাবরণ আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সারা দুনিয়ার অজস্র নানাবিধ প্রভাবের সংঘাত। এই প্রভাবগুলোর দ্বারা বিপর্যস্ত না হয়ে সেগুলোর থেকে যাঁরা ঠিকমতো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে নিয়ে নিজের দেশের ঐতিহ্য আর কৃষ্টির সঙ্গে সুষমভাবে মিলনসাধন করতে পারবেন, তারা শুধু তাঁদের শিল্পব্যক্তিত্ব নয়, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের শিল্পধারাকেও আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন। আমি দেশের নিজস্ব শিল্পধারার কথা বলছি, কারণ একেবারে নন-রিপ্রেজেনটেশনাল অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের কথা বাদ দিলে আজও 'গ্লোবাল ভিলেজে'র যুগে প্রত্যেকের দেশেরই শিল্পের একটা বিশিষ্ট চেহারা, সত্তা আর চরিত্র আছে যা নিখাদ দেশজ না হলেও দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী প্রভাবের সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফল। আমরা দেখছি তাঁদের নিজের-নিজের মতন করে এই সমন্বয়সাধন অতীতে করেছিলেন আমাদের কোমপানি শিল্পীরা, কালীঘাটের পটুয়ারা, আমাদের গত শতাব্দীর অজানা তৈল-চিত্র-আঁকিয়েরা, আমাদের থিয়েটারের শিল্পীরা, মহান সাহিত্যিকরা আর এই শতাব্দীতে অবনীন্দ্রনাথ আর অমৃতা শেরগিলের মতো শিল্পীরা। একটা বিদেশী শিল্পমাধ্যমকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নেওয়ার আমাদের যুগের মৃত্যুহীন উদাহরণ হল সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র। আমাদের এ যুগে যে মুষ্টিমেয় কজন ভারতীয় আর বাঙালি আর্টিস্ট এই দিশি-বিদেশীর সমন্বয় সাধনের সমস্যাটা খানিকটা সফলভাবে সমাধান করতে পেরেছেন তাঁরাই একমাত্র সার্থক ছবি আঁকতে পেরেছেন। তাঁদের ছবিতে তাঁদের ব্যক্তিগত আর দেশীয় বা আঞ্চলিক এমন চরিত্র আছে যা চোখ আর মনকেই মুগ্ধ করে। তা ছাড়াও, সেগুলি কে কে এঁকেছেন তা জানার জন্য ছবির তলায় নামের লেবেল লাগাতে হয় না।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

চোদ্দ

একটি কথোপকথন

কচি, ঘুমোলি?

না। একটা কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা, দাদিমা?

কী রে?

ছোটোদাদাজি যে বাঘদুটো দেখেছিলেন, তারাই যে তোমার শ্বশুরসাহেবের মাজারে সেলাম করতে আসত, কী করে জানলে?

শুনেছি।

সবই খালি শুনেছ। কিছু দেখ নি?

কী করে দেখব বল্? হিজরি ১৩১৩ সনে শ্বশুরসাহেব মৌলাহাটে এলেন। সেই থেকে খাঁচায় ঢুকলাম। হিজরি ১৩১৪ সনে আশ্বিন মাসে আমাদের দু বহিনের শাদি হল। খাঁচার দরজায় কুলুপ পড়ল।

দাঁড়াও, পঞ্জিকা দেখে হিসেব করি।

আঃ, আলো জ্বালে না। চোখে লাগে।

হুঁ, এটা হিজরি ১৩৭৩ সন। ইংরিজি ১৯৫৩। দাদিমা, বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল?

বারো-তেরো বছর হতে পারে। পরের বছর তোর আব্বার জন্ম হল।

ওম্মা! ওই বয়সে বিয়ে, বাচ্চার মা—দাদিমা, তুমি কী বলছ!

সে-আমলে তাই তো হত। তবে জানিস কচি, তোর আব্বার জন্মের সময় খবর গেল শ্বশুরসাহেবের কাছে। খুব জাড় পড়েছিল সেবার আঘুন মাসে। দুখু ফিরে এসে বলল, উনি এবাদতখানায়—মানে এখন যেখানে ওঁর মাজারশরিফ, জিনের মজলিশে আছেন।

ভ্যাট! বাজে গপ্প।

দুখু বলল, জানালার ফাঁক দিয়ে শাদা রোশনি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তখন শাশুড়িসাহেবা বললেন, নুরুকে খবর দে। এসে বাচ্চার কানে আজান দিক।

নুরু—মানে বড়োদাদাজি?

হুঁ। তো ভাসুরসাহেবও পাশকরা মওলানা। দেওবন্দে পাশ। এসে তোর আব্বার কানে আজান দিলেন। তখন শেষ রাত। আয়মনিখালা কুলকাঠের আগুন জ্বেলে আমার গা সেঁকছে। ধাইবুড়ি লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকছে।

দাদিমা, আমার দাদাজি তো ছিলেন। উনি আজান দিলেন না কেন?

ল্যাংড়া বোকাহাবা মানুষ। কষ্টে চলাফেরা করতেন। গলায় আওয়াজ বেরুত না।

আমার দাদাজি তো মেজো?

হুঁ। শ্বশুরসাহেব ইন্তেকাল করার সময় বলে গিয়েছিলেন, সে এই এবাদতখানার মালিক হবে। তারপর যখন মুরিদরা পিরসাহেবের মাজার বানিয়ে দিল, তোর দাদাজি সেখানেই থাকতেন। নজরানাটা সেলামিটা যা পড়ত, আদায় করতেন। বিঘে দশেক ভুঁই ছিল। তারও ফসল পেতাম আমরা। মায়ের সম্পত্তি এক ছটাক আমি নিই নি।

কেন নাও নি?...ও দাদিমা! বলো না। কেন নাও নি?

সেসব কথা চাপা আছে, চাপা থাক। রাত হয়েছে, নিঁদ যা।

দাদিমা, মাজারে নাকি ডাকাতরা খুন করেছিল দাদাজিকে?

আঃ, চুপ কর্ তো! খুন কেন করবে? কালা জিন গলা টিপে মেরেছিল।

আচ্ছা, দাদিমা, ছোটোদাদাজি নাকি ডাকাত ছিল?

কচি! ঘুমো।

বলো না দাদিমা, ছোটোদাদাজির কথা। জঙ্গলের ভেতর ভাঙা মসজিদ, চাঁদনি রাত, দুটো বাঘ—তারপর কী হল?

রাত জাগলে সকালে স্কুল যেতে পারবি নে। ঘুমো।

আলো জ্বালব বলে দিচ্ছি।

না, না!

অন্ধকারের প্রাণী তুমি, দাদিমা।

হুঁ, আঁধার আমার ভালো লাগে। সারাটা দিন আমার কষ্ট হয় রে! দিন কাটে না।

ঠিক আছে। নাও, শুরু করো। জঙ্গলে ভাঙা মসজিদ। চাঁদনি রাত। দুটো বাঘ খেলা করছে।

আমি তো দেখি নি। শুনেছি। এক বর্ষার রাতে দেওরসাহেব এলেন আম্মাকে দেখা করতে। তখন উনি স্বদেশী করেন। সে আমার শাদির দশ বছর পরের কথা। শেষ রাতে চলে গেলেন। পরনে হিন্দুর পোশাক।

ও দাদিমা! তাহলে বলো, ছোটোদাদাজি টেররিস্ট্ ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বইতে ওঁর নাম থাকা উচিত ছিল। আশ্চর্য! কেন নেই?

খুব নামি লোক হয়েছিলেন দেওরসাহেব। জেলা জুড়ে নাম। ম্যাজিসটের লাট রায়বাহাদুর খানবাহাদুর ওঁর ডরে গর্তে সেঁধিয়ে থাকত।

তবু হিস্ট্রিতে নাম নেই।

কথাটা তোর আব্বাও বলত। বলত, হিঁদুরা মোসলমানদের পাত্তা দেয় না। সেজন্যই তো হিঁদুস্তান-পাকিস্তান হল। তবে দেওরসাহেব শেষে স্বদেশী ছেড়ে খুনখারাপি করে বেড়াতেন। ওঁর মাথার দাম—

ছাড়ো! গপ্পটা বলো। জঙ্গল, ভাঙা মসজিদ, জোড়া বাঘ, চাঁদনি রাত।

বলি।...

গপ্পের কিয়দংশ

জঙ্গল চিরে ধবধবে শাদা মাটির রাস্তা। ঝলমলে জ্যোৎস্না। রাস্তার ধারে ভাঙা মসজিদ। একদল হাটুরে নিকিরি গিয়েছিল শহরে খন্দ বেচতে। কাঁধে বাঁশের বাতার ভার, দুধারে ঝোলানো ঝুড়ি। সেই দলের কাছে জানা হয়েছে এই রাস্তা গেছে পদ্মার ধারে সুপারিগোলার হাট। সামনে ভগবানগোলা। তখনও গঙ্গা বইত ভগবানগোলার কাছাকাছি। ভগবানগোলায় মামুজি আবু মিরের বাড়ি। পুরো নাম মির মোহাম্মদ আবু-তৈয়ব। হাটুরে নিকিরির দল আমাকে খুব খাতির করেছিল আমি আবু মিরের ভাগনে বলে। ওরা বলেছিল, ওরে বাবা! উনি এ তল্লাটের ডাকসাইটে পুরুষ। বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ওঁর নামে। ওরা যাবে অনেক দূর। রাস্তায় ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে। তাই ভাঙা মসজিদের উঁচু চত্বরে রাত কাটাতে গেল। বলল, পিরসাহেবের ছেলে আপনি। তার ওপর আবু মিরের ভাগনে। থাকুন আমাদের সঙ্গে। ভোরবেলা মিরসাহেবের ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাব। একা যাবেন না। লোকগুলোকে ভালো লেগেছিল। ওরা ভাঙা মসজিদ-চত্বরে বসে আমাকে গুড়মুড়ি খেতে দিল। পাশে একটা পুকুর ছিল। পানি এনে খেল। পানিটা বিস্বাদ। ওরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুল। আমাকে একটা চট দিল শুতে। দেখলাম ওদের কাছে লাঠি বল্লম কাটারি আছে। সেগুলো পাশে রেখে ওরা শুয়েছে। বরাবর দেখেছি, এইসব মানুষের ঘুমটা খুব গাঢ়। আমার পক্ষে ঘুমানো অসম্ভব। চট, তা ছাড়া বালিশ নেই। জ্যোৎস্নার আলোছায়া। হু-হু বাতাস। শনশন অদ্ভুত সব শব্দ। মামুজির কথা ভাবছিলাম। উনি কি আমাকে চিনতে পারবেন? সেই ছ বছর বয়সে একবার আম্মার সঙ্গে গিয়েছিলাম। গিয়ে তো ঝামেলা। পরদিনই ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে আম্মা চলে এলেন। সারা পথ কাঁদছিলেন আম্মা। কেন তা জানি না। মামুজি নাকি নেশাখোর মানুষ, এলাকার ডাকাত-সরদাররা ওঁর গোলাম। কত অদ্ভুত গল্প শুনেছি দাদি-আম্মার কাছে। মামুজিকে বাচ্চা বয়সে নাকি গোরা পলটন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওঁর আব্বা হাসু মিরকে না পেয়ে। কেন? দাদি-আম্মা বলেছিলেন, হাসু মির ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। ব্যাপারটা সিপাহি বিদ্রোহ হওয়া সম্ভব। মরহুম দাদাজিও নাকি সিপাহি বিদ্রোহের সময় লুকিয়ে বেড়াতেন। বারিচাচাজির কাছে সিপাহি বিদ্রোহের গল্প শুনেছি। মাত্র বছর আটত্রিশ আগের ঘটনা। হরিণমারার বড়োগাজি বলতেন, বাঙালি হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হিন্দুস্তান থেকে তামাম ইংরেজকে ভাগিয়ে দেওয়া যেত। ব্যাপারটা কিছু বোঝা যায় না। জানতে ইচ্ছে করে। গত মাসে লালবাগ শহরে মদ খেয়ে এক গোরা পলটন গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের বেইজ্জতি করত। আশ্চর্য ব্যাপার, ওই পান্না পেশোয়ারি তাকে শায়েস্তা করেছিল। পান্না শয়তান কিছু ভালো কাজ করে। তাই তাকে শহরের লোকে হয়তো ভালোবাসে। সবাই পান্নার পেছনে না দাঁড়ালে ওর বিপদ হত। মাতাল গোরাটাকে বহরমপুর ব্যারাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।... কাত হয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে চোখ খুলে দেখি, একটু তফাতে নীচের ফাঁকা জায়গায় দুটো বাঘ। ওখানে চাঁদের আলো। বাঘদুটোর লেজ নড়ছে। কেমন একটা কেঁউ-কেঁউ মিহি আওয়াজ ওদের গলায়। পরস্পরকে আঁচড়াচ্ছে। কামড়াচ্ছে। তারপর একটা বাঘ শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। অন্যটা তার পাশে পেছনের দু-পা ভাঁজ করে বসল এবং মাঝে-মাঝে সামনের একটা পা তুলে চাঁটি মারতে থাকল অন্যটার গালে, পেটে, থাবায়। আমি কাঠ হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। লোকগুলো নিঃসাড়। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে হল, বাঘদুটো বাঘ আর বাঘিনী এবং তারা যে আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, তার একটাই কারণ—আব্বা একদল জিন পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে বাঘ আর বাঘিনী খেলতে-খেলতে ওদিকে কালো জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। তখন ভাবলাম, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? লোকগুলোর একজনকে খিমচি কেটে জাগিয়ে ফিশফিশ করে বললাম, বাঘ! সে ঘুমজড়ানো গলায় শুধু বলল, হুঁঃ! বাতাসের শনশন শব্দের ভেতর দূরে যেন একবার বাঘ ডাকল। বাকি রাত আর ঘুমোনো অসম্ভব। ভোর রাতে ওদের সঙ্গে যাবার সময় গল্পটা

বললে ওরা গ্রাহ্য করল না। একজন বলল, বাঘ মসজিদ সালাম করতে আসে। মানুষের খেতি করে না। অবশ্য সে-আমলে পাড়াগাঁয়ে সবখানে জঙ্গল। সবখানে বাঘ। এরপর যখন দেবনারায়ণ রায় নামে একজন চমৎকার মানুষের সঙ্গে শাঁখালার জঙ্গলে আবাদের কাজ দেখতে যাই, তখন প্রায়ই সেখানে একটা করে বাঘ মারা পড়ত। বাঘ, বুনোশুওর, সাপ। মানুষও মারা পড়ত। তবে এই জোড়া বাঘের গল্প আমি একশো, দুশো বা তিনশো জনকে বলে থাকব। গল্পটা বাজে, অথবা গল্পটা আমার জীবনে খুব মূল্যবান। পরে যতবার মনে পড়েছে, শিউরে উঠেছি। তাহলে আমি আদতে কাদের দেখেছিলাম? মিথুনমত্ত বাঘ আর বাঘিনী এক জ্যোৎস্নারাতের জঙ্গলে—তারা কারা? দেবনারায়ণদা বলেছিলেন, এপ্রিল বাঘেদের মেটিং সীজন। হুঁ, ইংরেজি ১৮৯৬ সাল। তিরিশে এপ্রিল। তারিখটা মনে আছে। পান্না পেশোয়ারিকে ইট মেরে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাটুরে নিকিরির দলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। ভাঙা নবাবি মসজিদ জঙ্গলের ধারে। আসঙ্গলিপ্স্ দুটি বাঘ। বুকের ভেতর ক্রমশ তাদের গজরানি শুনতে পেতাম। তারা খেলতে-খেলতে অবচেতনার অন্ধকারে ঢুকে যেত। এই গল্পটা কাউকে বলা ঠিক হয় নি।…

ব্রহ্ম ও আনন্দ

আবু মির প্রথমে চিনতে পারেন নি শফিকে। তাঁর দুটি স্ত্রী ছিলেন। বড়োর বয়সের তুলনায় ছোটোটি নাবালিকা বলা যায়। আবু মিরকে দুজনেই প্রচণ্ড ভয় করতেন। অজিফা বেগম বড়োর নাম, তাঁর সতীন জরি বেগম। স্বামী বাড়ি না থাকলে দুজনে ঝগড়াঝাঁটি বেধে যেত। শফি যেদিন ওখানে পৌঁছয়, তার আগের দিন অজিফা বেগমকে তালাক দিয়েছেন আবু মির। হতভাগিনী একটি বাচ্চাও গর্ভে ধরতে পারেন নি। আর জরি বেগম স্বামিগৃহে এসেই গর্ভিণী হয়েছেন। আবু মির ফরসি হুঁকোয় তামাক টানছিলেন। উঠোনে একদঙ্গল লোক বসে ছিল। তারা গেঁজানো তালরস খাচ্ছিল। তাদের পাশে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি, তলোয়ার, ঢাল স্তূপীকৃত। কয়েকটি রণ-পা নিয়ে ছেলেদের খেলতে দেখেছে। ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ, গালপাট্টা, লাল চোখ—এইসব লোক যে ডাকাত, তার বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল। শফিকে অনেকক্ষণ জেরা করার পর আবু মির চিনেছিলেন, ছেলেটি তাঁর বোন সাইদারই সন্তান বটে। কিন্তু তিনি তত পাত্তা দেন নি শফিকে। শুধু জরিবেগম শফিকে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। দুপুরে যত্ন করে খাইয়েছিলেন। মুরগির গোশত, মাসকলাইয়ের বড়া আর কুমড়োর তরকারি। ভাতটা মোটা লালচে রঙের। আবু মির তখন বেরিয়েছেন। শফি খাওয়ার পর বলেছিল, মামিজি, আমি যাই। জরি বেগম বলছিলেন, কেন গো? ছোটোমামিকে ভাল লাগছে না বুঝি? বড়োমামি থাকলে ভালো লাগত? তা কী করব বলো, কাল তোমার মামুজি তাকে লোক ডেকে তালাক দিয়েছেন। শফি যদিও বা থাকত, আর থাকার ইচ্ছে করছিল না। সে মৌলাহাটে ফিরে যাবেই। ওজি বেগমের চেহারায় একটা নিষ্ঠুরতাও এর কারণ হতে পারে। সে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়িটা থেকে। শুকনো গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে একটা লোকের সঙ্গে দেখা। সে তরমুজখেতে বসে হুঁকো টানছিল। লোকটি তাকে মৌলাহাটের রাস্তা বাতলে দেয়। সেখান থেকে নাকি চোদ্দ ক্রোশ দূরত্ব। হাঁটতে-হাঁটতে একটা চটির কাছে সূর্য ডুবেছিল। চটির পেছনে হাটতলার চালাঘর। সেখানে একদল লোক বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটি পালকি ছিল। বেহারারা পা ছড়িয়ে বসে চিড়ে খাচ্ছিল। মাথায় লালফেট্টিবাঁধা পাইক হাতে লাঠি নিয়ে তম্বি করছিল লোকগুলোকে। শফি চটির সামনে বাঁশের মাচানে বসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। এমন সময় হাটতলার পেছন থেকে এক লম্বা চেহারার ভদ্রলোক গাড়ু হাতে পালকির কাছে এলেন। তাঁর পরনে ধুতি, পায়ে নাগরাজুতো, খালি গা। শফির দিকে চোখ পড়লে তিনি গাড়ু রেখে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, তোমার নিবাস?

এভাবেই কপালীতলার জমিদারদের ছোটো তরফ বাবু দেবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় শফির। দেবনারায়ণ ছিলেন খেয়ালি মানুষ। দাদা আর জ্ঞাতিদের সঙ্গে বনিবনা ছিল না তাঁর। কপালীতলায় প্রায় একঘরে হয়ে বাস করতেন। মামলামোকর্দমা করে শাঁখালা নামে একটা অনাবাদি জঙ্গলমহল ভাগে পান। কয়েকটি ছোটো নদী বা সোঁতার অববাহিকায় কয়েক বর্গমাইল নাবাল মাটি। সেখানে বসত বসাতে চলেছেন। একটা দল জমির লোভে কিছুদিন আগে সেখানে চলে গেছেন। এবার দ্বিতীয় দলটাকে নিয়ে চলেছেন। ওরা বা এরা এখনও ঘর-কন্না বউকাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে যেতে নারাজ। অবস্থা বুঝলে তারপর নিয়ে যাবে। দেবনারায়ণ মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে জানতেন। জাতবেজাত মানতেন না। বলতেন একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি। আমরা মানুষেরা সবাই পরম ব্রহ্মের একেকটি প্রকাশ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেতনাময়। কান করে শোনো, প্রকৃতি জুড়ে ব্রহ্মের তান। বায়ুর মর্মরে, বিহঙ্গের কাকলীতে, নদীর স্রোতধ্বনিতে, পুষ্পের প্রস্ফুটনে, সর্বত্র আনন্দ-রূপ ব্রহ্মতান। তাঁরই আনন্দে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। বলে তিনি গম্ভীর গলায় গান গেয়ে উঠতেন।

অর্থাৎ দেবনারায়ণ ব্রাহ্ম ছিলেন।…

বন্দেমাতরম্

দেবনারায়ণদা ছিলেন পাগল মানুষ। তবে তাঁর পাল্লায় পড়ে আমার জীবন অনেকখানি বদলে গিয়েছিল তো বটেই। শাঁখালা নামটা বদলে তিনি শঙ্খিনী রাখেন, যদিও লোকে সেটা নেয় নি। তবে উঁচু মাটির ওপর যে মূল বসতি করে ব্রহ্মপুর নাম দেন, সেটা চালু হয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় উপাসনাবেদি। নাম দিয়েছিলেন ব্রহ্মমন্দির। সেখানে চাষাভুষো লোকগুলোকে জড়ো করে আব্বার মতোই গম্ভীর স্বরে ভাষণ দিতেন। বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতেন। এসব ব্যাপারে আব্বার সঙ্গে তাঁর খানিকটা মিল তো ছিলই। শুধু আব্বার মতো তর্জন-গর্জনটা ছিল না। শান্ত এবং গম্ভীর, অথচ প্রসন্নতা ঝলমল করত মুখে। মাঝেমাঝে বলতেন, জানিস শফি, ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান আমার মুখস্থ? বলে কোনো একটি সুরা আংশিক আবৃত্তি করতেন। আমি উচ্চারণের ভুল শুধরে দিতাম। আমার সঙ্গে ইসলাম আর উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করতে চাইতেন। এইসব সময় আমার ভারি বিরক্তিকর মনে হত ওঁকে। আমার কাছ থেকে ততদিনে ধর্মাধর্ম অনেক দূরে সরে গেছে। অবশ্য আমার ভালো লাগত সন্ধ্যাবেলার আসরটা। ব্রহ্মমন্দিরের বেদিতে বসে থাকতেন দেবনারায়ণদা। ব্রহ্মকীর্তন শুরু হত। খোল বাজিয়ে গান। দেবনারায়ণদা ওদের বলতেন বৈতালিক। সেই প্রথম খুব কাছে থেকে সংগীতের স্বাদ আমি পাই। আব্বা বলতেন, একবার গানবাজনা শুনলে চল্লিশ বছরের বন্দেগি (উপাসনা) বরবাদ। অথচ এভাবে যদি আল্লার নামে গান গাওয়া হয়, কেন আল্লা চটে যাবেন জানি না। দেবনারায়ণদা আমাকেও গলা মেলাতে বলতেন। গান আমার আসে না। আর একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটত, কোনও ভদ্রলোক এলেই দেবনারায়ণদা আমাকে দেখিয়ে বলতেন, এই আমাদের সমাজের মুসলমান সদস্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তখন আমার পরনে ধুতি আর কামিজ। তাঁরা বলতেন, সত্যি নাকি? তাঁদের মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠত। আমি রাগ করে সরে যেতাম। একদিন এক ভদ্রলোক এলেন, তাঁর নাম যামিনী মজুমদার। রোগা এবং বেঁটে মানুষ। আমাকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরুলেন নতুন বাঁধের পথে। কিছুদূর চুপচাপ যাওয়ার পর হঠাৎ বললেন, তুমি কি সত্যিই

মুসলমান? বললাম, হ্যাঁ—আমার নাম সৈয়দ শফিউজ্জামান। আমার বাবা একজন পির। যামিনীবাবু আমার একটা হাত নিয়ে আস্তে বললেন, তুমি দেবুদার কাছে জুটলে কিভাবে? তাঁকে শুধু খানিকটা বললাম। বললাম না পান্না পেশোয়ারিকে মেরে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যামিনীবাবু বললেন, তুমি এখানে থেকো না। দেবুদাকে এলাকার ভদ্রলোকেরা পছন্দ করেন না। উনি ব্রাহ্ম। জমির লোভে কিছু-কিছু ভদ্রলোক এখানে এসে দীক্ষা নিয়েছেন ওঁর কাছে। এতে অনেকেই চটে আছে। এই বাঁধ গড়া হচ্ছে, শয়ে-শয়ে চাষাভুষো কোদাল কোপাচ্ছে—সামনের বছর ফসলও ফলাবে, কিন্তু আমার ভয় হয় কী জান? বর্ষায় বাঁধ কেটে দেবে কেউ। তা ছাড়া তুমি মুসলমান—ব্রাহ্ম হয়েছ। এলাকার মুসলমানরাও এটা সহ্য করবে না। আমি বললাম, আমি ব্রাহ্ম হই নি। যামিনীবাবু হাসলেন। তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন? বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছ না কেন? বললাম, আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে। যামিনীবাবু বললেন, কেন ভালো লাগছে? একটু ভেবে নিয়ে বললাম, নতুন মাটি আবাদ হচ্ছে। আমাকে দেখাশোনা করতে হয়। যামিনীবাবু বললেন, শুধু এজন্য? বললাম, এখানকার জঙ্গলে জানোয়ার আছে। মাঝে-মাঝে মারা পড়ে। সাঁওতাল বসতির লোকেরা শিকারের পরবে বেরোয়। তাদের সঙ্গে আমিও যাই। আমার এসব ভালো লাগে। যামিনীবাবু বললেন, এসো। এখানে একটু বসি। বাঁধের কিনারায় ঘাসের চাবড়া বসানো হয়েছে। সেখানে দুজনে বসলাম। একটু পরে যামিনীবাবু গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন। গানটা কোথায় শুনেছি মনে হল। মিঠে সুর।

বন্দেমাতরম্‌
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্‌
শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌…

উনি গান থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। কেমন লাগছে? বললাম, ভালো। উনি আবার গাইতে থাকলেন,

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্‌
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্‌
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্‌
সুখদাং বরদাং মাতরম্‌…

যামিনীবাবু বললেন, কিছু বুঝলে? ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। যামিনীবাবু হাসতে লাগলেন। দেবুদা তোমার মাথাটি খেয়ে ফেলেছেন। শোনো, গানটার মানে বুঝিয়ে দিই। এবার বললাম, গানটা আমি জানি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আমি পড়েছি। তা ছাড়া স্কুলে সংস্কৃত পড়েছি। যামিনীবাবু নড়ে বসে আমার পিঠে হাত রাখলেন, চমৎকার! বললাম, কিন্তু আনন্দমঠে মুসলমানদের ঘেন্না করা হয়েছে। বারিচাচাজি বলছিলেন—যামিনীবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কে তিনি? বললাম, নবাববাহাদুরের ছোটো দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি। যামিনীবাবু ভীষণ চমকে গেলেন। বললেন, চৌধুরিসায়েব তোমার আত্মীয় হন? কী আশ্চর্য! এতক্ষণ বলবে তো! একথা শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। বারিচাচাজিকে যদি ইনি খবর দেন আমি কোথায় আছি, আমার এখানে আর থাকা হবে না। তাই বললাম, ঠিক আত্মীয় নন। একটু-আধটু চেনা। যামিনীবাবু আমাকে বোঝাতে থাকলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু এই গানটা সত্য। দেশকে মা বলতে তোমার আপত্তি আছে? দেবুর থাকতেও পারে। সে সর্বত্র ব্রহ্মের অস্তিত্বই মানে। ওরা পুরুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনা করে। কিন্তু আমরা উপাসনা করি আসলে দেশের। দেশ আমাদের মা। শফি, দেশকে তুমি ভালোবাস না? স্বীকার কর না দেশের সঙ্গে মায়ের মিল আছে? …এই প্রথম আমি একজন 'স্বদেশীবাবু' দেখছিলাম। 'স্বদেশী'বাবুদের সম্পর্কে আমার তত কিছু ধারণা ছিল না। তাই ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া উচিত মনে হল। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যামিনীবাবু যা সব

বললেন, মনে হল, অবিকল এইসব কথাই আব্বার মুখে কিংবা হরিণমারার বড়োগাজির মুখে একটু অন্যভাবে শুনেছি। ইংরেজ আমাদের দুশমন। ফেরার পথে যামিনীবাবুকে বললাম, আপনি এখানে কদিন থাকবেন? যামিনীবাবু একটু হেসে বললেন, কেন? আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে নাকি? বললাম, না। আপনার সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছে করছে। যামিনীবাবু আমার হাত ধরে বললেন, বেশ তো! কিন্তু আর কিছুদিন তুমি এখানে থাকো। এখনই তোমাকে নিয়ে যেতে আমারও কিছু অসুবিধা আছে। তা ছাড়া তুমি মনঃস্থির করো। জিগ্যেস করলুম, কেন? আমি আসলে বলতে চাইছিলাম, আমি স্বাধীন। মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারি। যা খুশি করতে পারি। যামিনীবাবু আমার কথার জবাবে বললেন, আমরা এখনও সংঘবদ্ধ নই। দেশব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি। কিছু লোকের মধ্যে—যেমন আমাকে দেখছ, আমার মধ্যেও একটা সংকল্প দানা বেঁধেছে। আমরা চেষ্টা করছি, পরস্পর যোগাযোগ করে একটা সমিতি গড়া যায় নাকি। এই এলাকায় আমার আসার উদ্দেশ্যও তাই। এবার জিগ্যেস করলাম, আপনার নিবাস কোথায়? যামিনীবাবু একটু হেসে বললেন, বহরমপুরে ছিল। ওকালতি করতাম। তাই দেওয়ান বারি চৌধুরিকে চিনি। বললাম, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? যামিনীবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, ওদের নিজেদের মধ্যে মতান্তর আছে। সর্বত্র দলাদলি চলছে। একদল পইতে পরার বিরোধী—যেমন দেবুদা। দেবুদারা জাতিভেদ মানেন না। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-মুসলমান খ্রীষ্টান সবাইকে দীক্ষা দিচ্ছেন। অন্যদল চান ব্রাহ্মণের আধিপত্য। আচার্য হবেন শুধু ব্রাহ্মণ। পইতে ত্যাগ করবেন না ব্রাহ্মণেরা। যাই হোক, দেবুদার কাছে যেসব ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্রলোক এসে জুটেছেন, তাঁরা কিন্তু জমির লোভেই এসেছেন। বললাম, মুসলমানদের সঙ্গে দেবনারায়ণদার খুব মিল। যামিনীবাবু খুব হাসলেন।…কাদের সঙ্গে ওঁর মিল নেই? ক্রোশ পাঁচেক দূরে এক ইংরেজ সায়েব একটা রেশমকুঠি গড়েছে। তার নাম স্ট্যানলি। তার সঙ্গেও খুব মিল দেবুদার। কবে দেখবে সেও এসে পড়বে এখানে। অথচ আমার ইচ্ছা, ওই গোরাটাকে হত্যা করি। চমকে উঠে বললাম, সে কী! কেন? যামিনীবাবু গম্ভীর মুখে আস্তে বললেন, নুরপুর বান্নুক (রেশমকুঠি) এলাকার তাঁতিদের সর্বনাশ করেছে। আর স্ট্যানলি খুব অত্যাচারী। এইসব কথা বলতে-বলতে দেবনারায়ণদার ডেরায় পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যার উপাসনার আসর শুরু হয়েছে। বাঁশের খুঁটিতে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলছে রোজকার মতো। বেদিতে বসে দেবনারায়ণদা আব্বার মতো গম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছেন। যামিনীবাবু আস্তে বললেন, দেবুদার এটাই স্বর্গরাজ্য। ঘুরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, হলুদ একটু আলোয় বাঁকা হাসি। হাসিটা খারাপ লাগল। মজলিশে অন্যদিনের মতো বসতে যাচ্ছিলাম, যামিনীবাবু আমার হাত ধরে টেনে অন্ধকার অংশ ঘুরে ছিটেবেড়ার ঘরগুলোর দিকে নিয়ে গেলেন। 'অতিথিভবন' নামে সবচেয়ে লম্বা ঘরের বারান্দায় উঠে বললেন, ব্রহ্মসংগীত দূরে বসে শোনাই ভালো। একটু দূরত্বে না গেলে সত্যকে চেনা যায় না। এখান থেকে লোকগুলোকে লক্ষ করো। সত্য ধরা পড়বে।…যামিনীবাবুর এই হেঁয়ালি বুঝতে পারছিলাম না। একটু পরে দেবনারায়ণদার উদাত্ত গলায় আবৃত্তি ভেসে এল আলোর দিক থেকে,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে…

যামিনীবাবু চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, আনন্দ! কোথায় আনন্দ? সর্বত্র নিরানন্দ। সর্বত্র দুঃখ। অপমান। অত্যাচার।…

দ্বিতীয়.কথোপকথন

দাদিমা! দাদিমা!

আমি এখানে।

আশ্চর্য মানুষ তুমি! বাইরে কী করছ?

খোকা এল না !

না আসুক। তুমি এসে শুয়ে পড়ো ! এত রাতে বাইরে থেকো না !

আমার ডর লাগে, খোকা কোথায় থাকে এত রাত অব্দি ?

কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। তুমি এসো। দরজা এঁটে দাও।

জানিস কচি, খোকার স্বভাব অবিকল তোর ছোটোদাদাজির মতো ?

তাই বুঝি ?

আমার ডর হয়, কবে না পুলিশ ওকে—

আঃ ! চুপ করো। ঘুমোও।

তুই আমাকে অনেকদিন পরে দাদিমা বলে ডাকলি, কচি !

কে জানে বাবা ! তোমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে। কবে তোমাকে আবার দাদিজি বলতাম !

খোকা দাদিজি বলে। হুঁ, তুই দাদিমাই বলিস বটে। কিন্তু খোকা কেন দাদিজি বলে ?

ভূতের মুখে রামনাম ! ওর কথা ছাড়ো তো !

কচি, তুই একেবারে হিঁদু হয়ে গেছিস।

বেশ করেছি। হিন্দুদের দেশ। হিন্দু হতেই পারি।

যতই কর কচি, হিঁদুরা তোকে আপন করবে না।

তুমি অন্ধকারের প্রাণী। কী জান, কতটুকু জান ? সব বদলে গেছে এখন।

তোর ছোটোদাদাজি বলতেন, মোসলমানের একটা খোদা। হিঁদুর তেত্তিরিশ কোটি। মোসলমান একটা খোদা বরবাদ করতে পারে। হিঁদুদের তেত্তিরিশ কোটি খোদা বরবাদ করা কঠিন।

ছোটোদাদাজি তোমার হিরো !

কী বললি ?

ছোটোদাদাজি আমারও হিরো।

হিরো—সে আবার কী রে ?

দিনে বুঝিয়ে বলব। আমার ঘুম পাচ্ছে।

চুপ ! ওই বুঝি খোকা এল ! খোকা, এলি ?

আশ্চর্য ! বাতাসের শব্দ। তোমার কানেও কি বাহাত্তুরে ধরেছে ?

আমার শাশুড়িসাহেবা ঠিক এরকম করতেন, জানিস ? একটু আওয়াজ হলেই সাড়া দিয়ে বলতেন, শফি এলি ? সারারাত এরকম। খালি ঘর-বার, খালি ছটফটানি। তারপর এক বর্ষার রাতে টিপটিপ করে পানি পড়ছে। হাওয়া বইছে উথালপাতাল। আয়মনিখালা শাশুড়িসাহেবার কাছে শুয়ে আছে। হঠাৎ জানলার বাইরে—

ঘুম পাচ্ছে। কাল রাতে শুনব।

হঠাৎ জানলার বাইরে ডাক, মা ! আয়মনিখালা বলল, শফি। শাশুড়িসাহেবা বললেন, অন্য বাড়িতে কেউ ডাকছে। শফি হলে আম্মা বলে ডাকত। আয়মনিখালা বলল, না—পষ্ট শুনলাম শফির গলা।

বকো তুমি আপন মনে। আমি শুনছি না কিন্তু!

আয়মনিখালা জানালা খুলে বলল, শফি ? দেওরসাহেব রাগ করে বললেন, ভিজে গেছি। আর একবার ডেকে চলে যেতাম। আয়মনিখালা দরজা খুলে ভিজতে-ভিজতে বেরিয়ে গেল। শাশুড়িসাহেবা লানটিন জ্বালবেন কী, বোবায় ধরেছে। কাঠ হয়ে বিছানায় বসে আছেন। শোরগোল শুনে লম্প জ্বেলে বেরিয়ে দেখি,—কে এক জোয়ান পরপুরুষ। পরনে হিঁদুর পোশাক। মুখের পানে তাকিয়েই ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, দেওরসাহেব বললেন, আর তো তুমি বলা যাবে না। রুকু বলেও ডাকা যাবে না। মেজভাবি, কেমন আছেন ? আমার বুক ফেটে কান্না এল। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ঘরে ঢুকে গেলাম।…

একটি পিস্তল, একটি কান্না

দেবনারায়ণদার ব্রহ্মপুরে জমজমাট অবস্থা। পাকা বাড়ি উঠেছে। ব্রহ্মোপাসনার বেদি ঘিরে দালান গড়া হয়েছে। অনেকগুলো থামের মাথায় ছাদ। মাটির বেদি শাদা পাথরে বাঁধানো হয়েছে। বাইরে মাথার ওপর লেখা আছে "ব্রহ্মপুর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। নরনারী-জাতিধর্মনির্বিশেষে অবাধ প্রবেশ-অধিকার।" তারও ওপরে লেখা : "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ !" বেদির সামনে লেখা : "ওঁ তৎসৎ।" আরও কিছু বৈদিক মন্ত্রও লেখা ছিল চারদিকে। এটা ছিল আশ্রমের অংশ। আশ্রমের বাইরে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়। ব্রাহ্ম দাতব্য চিকিৎসালয়। একটা বয়স্ক শিক্ষামন্দির গড়ে তোলা হচ্ছিল আবাদের বয়স্ক চাষাভুষো মানুষদের জন্য। দেবনারায়ণদার পরিচয় তখন 'আচার্যদেব'। দেব কেন, জিগ্যেস করলে একটু হেসে বলতেন, সম্মানিত অর্থে। বলতাম, আমিও আচার্যদেব বলে ডাকব, দাদা ! আমার দ্বিগুণ বয়সের মানুষটি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, সেই যে তারাপুর চটিতে তোর সঙ্গে পরিচয় হল আর তোকে বললাম 'আমাকে দেবনারায়ণদা বলে ডাকবে', দ্যাট ইজ ফাইনাল। যামিনীবাবু সেই যে চলে গেলেন, আর একবছর আর পাত্তা পাই নি। পরের বছর শীতের সময় যখন নতুন আবাদে ফসল উঠেছিল, খবর পাওয়া যায়, নুরপুর কুঠির মালিক স্ট্যানলিকে পিস্তল ছুড়ে গুলি করতে যান। পিস্তলে গুলি বেরোয় নি। উলটে স্ট্যানলির পিস্তলের গুলিতে ওঁর বুক ছ্যাঁদা হয়ে যায়। সারা এলাকা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। চাপা সন্ত্রাস চারদিকে কয়েকটা মাস। গ্রীষ্মকালে এক ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেয়েকে দেবনারায়ণদা বহরম-পুর থেকে পালকি করে নিয়ে আসেন। আশ্রমের একটি ঘরে থাকতে দেন। আমার জানতে অনেক দেরি হয়েছিল, ওঁরা যামিনীবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে। কাউকে জানতে দেন নি দেবনারায়ণদা। আমাকেও না। একদিন লাইব্রেরি ঘরে বসে "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের" (দেবনারায়ণদা বাবু কথাটি জুড়ে দিতেন) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি খুব মন দিয়ে পড়ছি, জানালার ওধারে ফুলগাছের কাছে, আনমনে চোখ তুলে একটি মেয়েকে দেখলাম। তখন যে-কোনো মেয়ে দেখলেই রুকুর সঙ্গে তুলনা করার অভ্যাস ছিল। হয়তো আমার মনে ওই প্রচণ্ড কবিতাটির আবেগ ছিল, আমার দৃষ্টিতে তার প্রকাশ ঘটে থাকবে, মেয়েটি মুখ নামিয়ে নিল। দেখলাম, সে সাজিতে করে ফুল তুলছে। ওদেরই দেবনারায়ণদা বহরমপুর থেকে নিয়ে এসেছেন জানি। নিজের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। মেয়েটির নাম আমি জানতাম, ভারি অদ্ভুত নাম : স্বাধীনবালা ! তার মায়ের নাম সুনয়নী। সুনয়নী আমাকে অবাক চোখে দেখতে-দেখতে বলতেন, তোমাকে বাবা মোছলমান বলে মনেই হয় না ! রাগ হলেও মুখে হাসতাম। বরাবর একটা কথা শুনতে-শুনতে অবশ্য খানিকটা সয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনবালাকে ফুল তুলতে দেখার পর, তাছাড়া ওইরকম সুন্দর চোখনামানো ভঙ্গি, আমার মনে হল, হয়তো যামিনীবাবু ঠিক বলেন নি, সেই যে বলেছিলেন, 'কোথায় আনন্দ' ? এই তো আনন্দ। ওই ফুল, ওই মেয়ে। আর ততদিনে দেবনারায়ণদা যেন আমার মাথায় আনন্দ ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আবাদের চাষিদের কোদাল কোপানোতে আনন্দ অনুভব করি। লাঙলের ফালে কর্ষিত উর্বর মাটির চিরে যাওয়াতে আনন্দ দেখি—ওইখানে একদিন অঙ্কুরিত হবে শুকনো বীজ থেকে সবুজ শস্য। বীজও নিজেকে চিরে নিয়ে আসে শ্যামলিমার লাবণ্য। জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে বৃক্ষলতার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলে ওঠেন, 'ওই আভূমিপ্রণত শ্যামলতা দুলিতেছে।' আমি বদলে যাচ্ছিলাম অথবা বদলে গিয়েছিলাম। পান্না পেশোয়ারি কথা, সিতারার কথা, লালবাগ শহরের সমস্ত কথা পায়ের তলায় মাড়িয়ে ততদিনে আমার চলার গতি কমেছে। লাগামছাড়া ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছি, চলে গেছে পেছনে, আমি পায়ে হাঁটছি। নিজের পায়ে হাঁটার মধ্যে আবিষ্কার করছি, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ ! যা ধ্বংস, যা মৃত্যু, যা দুঃখ, সবই একটি আনন্দের মৃত্যুর পর অপর একটি আনন্দের জন্ম। কদিন পরে সেই লাইব্রেরি ঘরে বসে "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের" আরেকটি চটি বই পড়ছি,

আমাকে চমকে দিয়ে স্বাধীনবালা ঢুকল। মুখ তুললাম না। সে বইয়ের আলমারিতে কোনো বই খুঁজতে থাকল। তারপর আস্তে বলল, আচ্ছা, লাইব্রেরিতে কোনো উপন্যাস নেই ? বললাম, জানি না। স্বাধীনবালা একটু হাসল। কেন ? আপনিই নাকি লাইব্রেরিয়ান ? বললাম, না তো! স্বাধীনবালা বলল, দেবুজ্যাঠা বলেছেন। আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবেন না তো ? মাথা নাড়লাম। স্বাধীনবালা বলল, আপনি কি সত্যিই মুসলমান ? ইচ্ছে হল রেগে একটা কড়া জবাব দিই, ওকে বলি—মুসলমান কি সৃষ্টিছাড়া প্রাণী যে তাকে আলাদা করে চিনে নিতে হবে ? স্বাধীনবালা বলল, আমরা ব্রাহ্ম হয়েছি। ব্রাহ্মধর্মে হিন্দুমুসলমানখ্রীষ্টান ভেদাভেদ নেই। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফের বলল, আপনার নামটা কী যেন—বললাম, সৈয়দ শফিউজ্জামান।। স্বাধীনবালা বলল, উচ্চারণ করতে পারব না। ডাকনাম নেই আপনার ? আস্তে বললাম, শফি। স্বাধীনবালা বলল, আপনাকে শফিদা বলব। আচ্ছা শফিদা, আপনার বাড়ি কোথায় ? বললাম, মৌলাহাট। স্বাধীনবালা জেরা করে ঠিক ওর বাবার মতোই জেনে নিতে চাইছিল, কেন এবং কিভাবে আমি এখানে এসে জুটেছি। আমি একইভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। শেষে বললাম, আপনার বাবার সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। অমনি স্বাধীনবালা চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল, বাবা সম্পর্কে ও খুব কম জানে। আমি যামিনীবাবুর সঙ্গে আমার যা-সব কথা হয়েছিল, বললাম। শোনার পর স্বাধীনবালা আনমনা ভঙ্গিতে আঙুলে আঁচল জড়াতে-জড়াতে (আঃ! রুকুর এই ভঙ্গিটি মনে পড়ছিল।) বলল, আমার একটা পিস্তল থাকলে আমি স্ট্যানলিকে গুলি করে মারতাম। এই কথাটা আমার বুকের ভেতর ধাক্কা দিল। ওকে কিছু বলতাম, কিন্তু দেবনারায়ণদা এসে গেলেন। মাঠ থেকে এসেছেন। খালি পায়ে ধুলোকাদা। মুখে ঘাম। কোনার দিকে তক্তাপোশে বসে বললেন, একটা কথা মাথায় এসেছে। দুজনেই শোন্। শফি তো সেকেণ্ড ক্লাশ অব্দি পড়েছে। স্বাধীন পড়েছিস মাইনর অব্দি। ঠিক আছে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের দুজন টীচার পাওয়া গেল। শফি পড়াবি পুরুষদের, স্বাধীন মেয়েদের। কী ? রাজি ? স্বাধীনবালা খুশি হয়ে বলল, হুঁউ। আমি বললাম, কিন্তু—দেবনারায়ণদা রাগের ভঙ্গি করে বললেন, তোর মাথার ভেতর একটা কিন্তুর গোঁজ বসানো আছে। ওটা ওপড়ানো দরকার। স্বাধীনবালা হেসে উঠল। দেবনারায়ণদা বললেন, হ্যাঁ। ওই কিন্তুটা তোর সর্বনাশ করবে, শফি! সামনে তোর বিশাল জীবন পড়ে আছে। তাকে ফুলেফলে ভরিয়ে তুলতে হবে—যেভাবে আমি আবাদের কাজে নেমেছি। বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু তাঁর ওই প্রশ্নটা আমার দারুণ ভালো লাগে : 'জীবন লইয়া কী করিব ?' তোকে একটা কথা বলি, শোন্। মুসলমান আর ব্রাহ্মদের মধ্যে একটা সাধারণ বেসিক ইউনিফর্মিটি আছে। মুসলমানধর্মে যার জন্ম, তার তিনটে মূল কালচার। ইসলামি কালচার, পারিপার্শ্বিকগত হিন্দু কালচার আর শিক্ষাসূত্রে লব্ধ পাশ্চাত্ত্য আধুনিক কালচার। ব্রাহ্মদেরও তাই। ইসলাম-খ্রীষ্টান-হিন্দু। হিন্দু মানে অরিজিন্যাল বৈদিক কালচারের কথাই বলছি। সুতরাং···দেবনারায়ণদা মুখ খুললে থামতে চাইতেন না। আমি আড়চোখে দেখছিলাম, স্বাধীনবালা খুব মন দিয়ে বক্তৃতাটা শুনছে। এর মাসখানেক পরে এক বিকেলে বাঁধে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, স্বাধীনবালা আসছে। চোখমুখে পাগলাটে ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, সেই স্ট্যানলি এসেছে দেবুজ্যাঠার কাছে। শফিদা, আমাকে তুমি একটা পিস্তল জোগাড় করে দিতে পার ? পার না শফিদা ? কতজনের সঙ্গে তোমার জানাশোনা। সে কেঁদে ফেলল। তোমায় পায়ে পড়ি শফিদা! আমাকে একটা পিস্তল জোগাড় করে দাও। আমি বিকেলের গোলাপি রোদে ওর কান্নাটা হয়তো উপভোগ করছিলাম।···

(ক্রমশ

দুর্গাপূজায় আধুনিকতা

অনিরুদ্ধ চৌধুরী

দুর্গাপূজা সম্পূর্ণভাবেই একটি বাঙালি অনুষ্ঠান। দেবীর আগমনে বাঙালি মনে কতখানি ধর্মভাব জেগে ওঠে বলা শক্ত, কিন্তু শারদীয় উৎসব যে বাঙালি জীবনের অতি প্রিয় সামাজিক অনুষ্ঠান, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আজ থেকে বহুকাল আগে যখন দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছিল তখন বাঙলাদেশে কোনোরকম শহর বা শহুরে আবহাওয়া ছিল না। তখন এদেশে বড়ো লোকালয় বা নগর বলতে বোঝাত রাজার রাজধানী, নয়তো দু-চারটি বাণিজ্যিক বন্দর। আজকের মানুষ সেইসব নগর-বন্দর দেখলে "গ্লোরিফায়েড ভিলেজ" ছাড়া আর-কিছু বলবে না। সেকালে অধিকাংশ মানুষের জীবনে দিনগুলি কেটে যেত ছোটো-ছোটো সব ঘুমিয়ে-থাকা গ্রামগুলিতে—জীবন যেখানে শান্ত, গতিহীন, একটা দিন ঠিক আর-একটা দিনের মতোই বৈচিত্র্যবর্জিত। তাই বর্ষাশেষে শারদপ্রাতের সোনালি রোদ যখন ছড়িয়ে পড়ত মেঘমুক্ত আকাশে, গাছের পাতায়-পাতায়, বাড়ির আঙিনায়, মানুষের প্রাণে তখন আগমনীর সুর বেজে উঠত। ঘুমন্ত গ্রামগুলি জেগে উঠত। আনন্দঘন তিনটি দিনের প্রস্তুতিতে জেগে উঠত ঘুমন্ত মানুষগুলোও।

ঘরে বাইরে দিকে-দিকে ব্যস্ত হয়ে উঠত মানুষ। গৃহিণী ব্যস্ত হয়ে ঘর গুছোতেন। বিবাহিতা কন্যা শ্বশুরালয় থেকে আসবে ভেবে মুখে হাসি ফুটত। বউঝিদের ব্যস্ততাও কম নয়—কত মিষ্টি বানাতে হবে। নারকেলের চিড়াজিরা, নাড়ু, তকতি, খইয়ের মুড়কি, আরও সব কী কী। বিজয়া করতে আসবে গ্রামবাসী—আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব পরিচিত জন। এত মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো বড়ো সহজ কাজ নয়। পটুয়ার বাড়িতেও উৎসাহের জোয়ার। সারা বছরের বড়ো উপার্জনের সময় এল। সিংহবাহিনীর মূর্তি গড়তে যেমন পরিশ্রম, তেমনি সময়। পটুয়া তার রঙের ঝাঁপি খুলে বসত। মায়ের সারা অঙ্গই তো সোনার বরন। সেই সোনারঙ তৈরি করা কি সহজ

কাজ! তাঁতিপাড়াতেও মেয়েমরদ সকলেরই কাজ—মেয়েরা তকলিতে সুতো কাটত, পুরুষেরা তাঁতে বসত—উদয়াস্ত তাঁত চলত ঘটাঙ ঘট, ঘটাঙ ঘট; তবেই না গ্রামের মানুষ নতুন ধুতিশাড়ি পরতে পারবে। বন্ধ হবে টোল পাঠশালা। ছেলের দল সকাল-দুপুর হই-হই করে বেড়াবে—সন্ধ্যা পার করে আঁধার নামলে ঘরে ফিরবে। ওদিকে সন্ধ্যাবেলা জমিদারবাড়ির নহবতখানা থেকে সানাইয়ে আগমনীর সুর গ্রামের আকাশবাতাস মথিত করে বাজতে থাকবে। জমিদারবাড়ি তখন সারা দিনই কর্মমুখর, সারা গ্রামে ওই একখানাই তো পুজো।

লক্ষ্মীপূজার মতো দুর্গাপূজা ঘরে-ঘরে হত না—মা দুর্গতিনাশিনীর পূজার যে বিরাট আয়োজন। ধন-বল চাই, চাই জনবল। গ্রামে সেই আয়োজন কেবল জমিদারবাড়িতেই সম্ভব। তাই সেকালে পূজার আয়োজন ছিল একজনের, কিন্তু আনন্দ ছিল সবাকার। সেকালের মানুষ জানত আনন্দের অভিজ্ঞতাটি শুভংকরীর অঙ্ক নয়—যতই ভাগ হয় ততই বেড়ে যায়, কমে না। জমিদারবাড়ির পূজাপ্রাঙ্গণে যখন থেকে মূর্তিগড়া শুরু হত, ছেলে বুড়ো সবাই এসে বারবার করে দেখে যেত। পটুয়া মূর্তিতে রঙ চড়াবার আগেই শাস্ত্রীমশাই আসতেন, পটুয়াকে মনে করিয়ে দিতেন শাস্ত্রে মায়ের রূপবর্ণনার কথা। চোখ কেমন হবে, কানের থেকে তার দূরত্ব কতটুকু, কপালের কতটুকু থেকে চোখের টান শুরু হবে, কেমন হবে চোখের নীচের দৃষ্টি, কেমন হবে ভ্রূরেখাটি, দশ হাতের কোন্‌টিতে কী থাকবে। শাস্ত্রের নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হবে।

তারপর একদিন হিমালয় থেকে নেমে আসতেন মা-দুর্গা বঙ্গের পল্লীতে, যেদিন পুরোহিত বৈদিকমন্ত্র-উচ্চারণে মাতৃমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন।

এমনি করেই বাঙলার পল্লীতে পূজার আনন্দ-মধুর দিনগুলি আসত। বহু-বহু বছর ধরে ঠিক একই ধারায় একই ভঙ্গিতে চলে এসেছে বাঙালির দুর্গাপূজা। তার মধ্যে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে কত ঘটনাই না ঘটেছে। গ্রীক বীর শেকেন্দর শাহ পৌঁছেছিলেন ভারতসীমান্তে, মুগ্ধ হয়েছিলেন হিন্দু রাজার বিক্রমে। দিল্লির সিংহাসন নিয়ে কত রেষা-রেষি, কত যুদ্ধ, কত-না হানাহানি। বিদেশী দস্যু ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করেছে বারবার—উত্তরভারতের মাটিতে রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের পূর্ব-প্রান্তের বনজঙ্গলের মাঝে-মাঝে আর নদী-উপনদীর তীরে-তীরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাঙালি পল্লীগ্রামে এইসব ঘটনার ঢেউ এসে পৌঁছত না। বিব্রত করত না ঘুমন্ত গ্রামের নির্বিরোধ মানুষকে।

এমনি করে অনেক অনেক বছর কেটে গেল। পাঠানরা এল। একদিন তাদের পতনও ঘটল। এল মোগল, কিছুকালের জন্য দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু বাঙলার পল্লীবাসীর জীবন একই ধারায় বয়ে চলল। শুধু একটি নতুন ঘটনা ঘটল—পল্লীগ্রামের কিছু মানুষ ইসলামধর্ম বরণ করলেন। তাঁরা আর "জয় শিবশঙ্কর" বলেন না, দুঃখের দিনে "দুর্গা দুর্গা" বলে ডেকে ওঠেন না। দুর্গাপূজার সময় এঁরা কিন্তু পূজা দেখতে আসতেন, প্রসাদও নিতেন।

মোগল শাসন যখন শেষ হবার মুখে তখন যে বরগির হাঙ্গামা শুরু হয় তার হামলা থেকে বঙ্গের বহু গ্রাম নিস্তার পায় নি। বরগিদের ভয়ে তখন মানুষ এতই উদ্‌বিগ্ন থাকত যে পূজার আনন্দে ভাটা পড়েছিল। যবে থেকে মোগল সাম্রাজ্যের শক্ত বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে শুরু করল, দেশের শান্তিশৃঙ্খলা ঘুচে গেল। গ্রামে-গ্রামে ডাকাতের হানা, রাতদুপুরে লেঠেলদের অতর্কিত আক্রমণ, পূর্ববঙ্গে মগ দস্যুদের প্রবল অত্যাচার। রাস্তায় জনপ্রাণী হাঁটে না, বন্দরে নৌকা লাগে না। বহু জায়গায় চাষিরা অত্যাচারের ভয়ে চাষবাস ছেড়ে জঙ্গলে পালাল। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশে। সেই অশান্তি-উৎকণ্ঠার দিনে ষোড়শো-পচারে দুর্গাপূজা অসম্ভব। মাটির ঘটে দেবীকে আবাহন করে, তাতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, কোনোরকমে নমো-

নমো করে পূজার পাট সারা হত।

তারপর একদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল। ইংরেজ বণিকদের উদ্দেশ্য রাজা হওয়া নয়, রাজ্যশাসন নয়, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারও নয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের বাণিজ্য। কিন্তু দেশে শান্তি না থাকলে বাণিজ্য হয় না। তাই বাণিজ্যের স্বার্থেই দেশ-শাসনের দায় নিতে হল। তাদের বাহুতে বল ছিল, ধনবলও ছিল, আর ছিল বুদ্ধিবল। লজ্জার হলেও কথাটা সত্যি যে মোগল রাজত্বের অবসান হয়ে ইংরেজ রাজা হওয়ায় বঙ্গদেশের বেশ-কিছু মানুষ তখনকার মতো হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এই প্রসঙ্গে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" স্মরণ করুন:

'সত্যানন্দ। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। এখনও কলিকাতায় ইংরাজ প্রবল।

মহাপুরুষ। হিন্দু রাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না।

সত্যানন্দ। হে প্রভু, যদি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইবে না তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?

মহাপুরুষ। না। এখন ইংরেজ রাজা হইবে।… ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।'

দেশে শান্তি ফিরে এলে আবার পুরনো দিনের পূজাপার্বণও ফিরে এল। ফিরে এল দুর্গাপূজাও। দরিদ্র জীবনের সব দুঃখকষ্ট রহিত হল—এমন নয়। সব অভাব-অভিযোগ, দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েই পল্লীর মানুষ আবার পূজার আনন্দে মেতে উঠল।

এদিকে দেশে নতুন যুগের আগমনবার্তা ধ্বনিত হল। বাঙলা পুরোপুরি দখলে আসবার আগেই দিল্লির ফরমান পেয়ে কোমপানি কলকাতা শহরের পত্তন করেছিল। তৈরি হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম। ইংরেজ-দের ব্যবসার পত্তনি এবং প্রসার হতে-হতেই এদেশের বণিকমহাজনগোষ্ঠী ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে এল। ফলে তাদেরও আশাতীত ধনবৃদ্ধি হতে লাগল। গ্রামদেশ থেকেও কিছু-কিছু সচ্ছল অবস্থার মানুষ ধনবৃদ্ধির আশায় ক্রমবর্ধমান কলকাতা শহরে এবং তার আশেপাশে বসতিস্থাপন শুরু করল। দ্রুত দোকান-বাজার বসতে লাগল। শহর কলকাতা দেখতে-দেখতে বেড়ে উঠল। ক্লাইভ সাহেবের তৎপরতায় বাঙলায় ২৫ লক্ষ লোকের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বসল কোমপানির, আর বাৎসরিক খাজনা হল ৫৩ লক্ষ টাকা। কোমপানির কোর্টকাছারি বসল। অর্থোপার্জনের নতুন-নতুন রাস্তা খুলে গেল। সৃষ্টি হল অ্যাটরনি, উকিল, মোকতার, তাদের মুহুরি। রাজসরকারেও চাকরি হল কিছু-শিক্ষিত মানুষের। লেখাপড়ার ব্যবহারিক মূল্য বেড়ে গেল। অল্প ইংরেজি জানলেই ইংরেজের "হউসে" চাকরি হত। অর্থাৎ একটি শহুরে মধ্যশ্রেণী তৈরি হল। তাঁদের সবার আর্থিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা এক নয়। কিন্তু তাঁরা সবাই "বাবু" হলেন। এটি ইংরেজদের দেওয়া নাম। অর্থাৎ যাঁরা গ্রামের মানুষের মতো আদুল গায়ে থাকেন না, ফরসা জামা গায়ে দিয়ে কোর্টকাছারিতে কিংবা সরকারে অথবা ইংরেজ মালিকের "হউসে" কাজ করেন তাঁরা সবাই "বাবু"—মধ্যশ্রেণীভুক্ত ভদ্রলোক। এঁদের মধ্যে যাঁরা "ধনী" হলেন তাঁরা আর "বাবু" রইলেন না—অনেকেই "রাজা" বনে গেলেন। তাঁদের যত-না ক্ষমতা ছিল তার থেকে বেশি ছিল দাপট আর আস্ফালন।

এইরকম যখন শহুরে সভ্যতা ধীরে-ধীরে জাঁকিয়ে বসছিল তখন এই "রাজা"রা জনসমাজে পদমর্যাদা বাড়াবার জন্য দুর্গাপূজা শুরু করলেন। (মনে রাখতে হবে, ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এদেশে প্রবেশ করলেও মানুষের অন্তরে ফিউডাল মূল্যবোধগুলি তখনও প্রবল। তা নইলে রাজাদের দুর্গাপূজা করার বাসনাই বা কেন?) এই তথাকথিত রাজাদের কলকাতায় অথবা আশেপাশে নতুন-নতুন সুবৃহৎ অট্টালিকায় স্থান পেল প্রশস্ত দুর্গাদালান আর পূজাপ্রাঙ্গণ।

এইসব পূজাপ্রাঙ্গণে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ব্যানড পার্টির আড়ম্বর প্রায়ই দেখা যেত। ব্যানড পার্টি ইংরেজ প্রভুদের আমদানি। সেই বাজনা পূজাঙ্গনে যতই বেমানান হোক, তাতে আড়ম্বর বৃদ্ধি পেত। দুর্গাদালান আর পূজা-আঙিনার সামনে নাটমন্দিরও তৈরি হল। সেই নাটমন্দিরে দেবতাদের প্রীত্যর্থে ধ্রুপদী সংগীত হত না। সেখানে কোমপানির পত্নী-বিরহী সাহেবদের কণ্ঠ তৃপ্ত হত বোতলজাত বিলিতি কারণবারিতে আর দেহমনকে তৃপ্তি দিত সমকালীন সুবিখ্যাত সব রূপোপজীবিনীরা। বলতে গেলে, এইখান থেকেই পূজায় আধুনিকতার শুরু। এর আগে পল্লীগ্রামে জমিদারগৃহে যে পূজার আয়োজন হত তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ভাবগম্ভীরতা বজায় থাকত। আর যাই হোক, বেলেল্লাপনার কোনো সুযোগ থাকত না। তার মানে এই নয় যে জমিদারবাবু আর তাঁর ইয়ারবকসীরা কারণরসে মজতেন না, অথবা সুপক্ক নারীদেহের প্রতি তাঁরা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু দেবীর আগমনকে উপলক্ষ করে বেলেল্লাপনার প্রশ্রয় সম্ভব ছিল না। ফুলচন্দন আর ধূপের ধোঁয়ার গন্ধে সুরভিত পূজাপ্রাঙ্গণ, সন্ধ্যায় ধুনুচি আর প্রদীপ নিয়ে আরতিনৃত্য, ঢোল আর কাঁসরঘণ্টার বাজনা—এইসব মিলে একটা পবিত্রতার অনুভূতি জাগত। কিন্তু কলকাতাবাসী রাজাদের পূজার উৎসবে তার অভাব ঘটত। ঐশ্বর্যের একটা উৎকট প্রকাশ শুচিতার অনুভূতিকে মলিন করে দিত।

দেবী দুর্গা সত্য, দ্বাপর, কলি—কোনো যুগেই আধুনিক নন, হবার উপায়ও নেই। সুদূর অতীত থেকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী যে চিরন্তনী শক্তির সাধনা করেছেন আর্য ঋষিরা, দেবী দুর্গা তারই একটা বহিঃরূপ। সাধকদের একটি রূপকল্পনা। তাই ইংরেজ-প্রভাবিত এই নতুন ধনীরাও দেবীর রূপের ব্যাপারে বা পূজাপদ্ধতির ব্যাপারে কোনো আধুনিকতা বা পরিবর্তন প্রবর্তন করতে সাহসী হন নি। তবে তাঁরা পূজা উপলক্ষে যে জাঁকজমক, ধূমধাম এবং আমোদ-প্রমোদের প্রচলন করলেন, সেটা সেকালের হিসেবে আধুনিকতা বটেই। ওই ধরনের জাঁকজমকের আতিশয্য হিন্দুর পূজায় কখনও ছিল না। এইসব আমোদ-প্রমোদের একটা হল সাহেবদের এবং সাহেবিভাবাপন্নদের বিলিতি কায়দায় অমিত পরিমাণে বিলিতি পানীয় বিলিতি খাদ্য পরিবেশন। শোনা যায়, এইসব ডিনারে জোগান হিসাবে বিরাট আকারে কুক্কুটবধযজ্ঞ সমাধা হত। এটাও একটা আধুনিকতা। কারণ কুক্কুট সে যুগে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্য ছিল। আমোদ-আহ্লাদের আর-একটি অঙ্গ ছিল বিলিতি বলনৃত্য। পশ্চিমা সভ্যতায় সব উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হল স্ত্রী-পুরুষের একত্র নাচ। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে কোথাও এই নৃত্যের উল্লেখ নেই, এমন-কি কামুকশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্রের উৎসবেও এ বস্তু ছিল না। দেবতারা নিশ্চয়ই নাচ দেখতেন, কিন্তু নাচতেন না—নাচত অপ্সরীরা। কলকাতার নব্য ধনীরা পূজা-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বলনাচটি চালু করেছিলেন—যদিও সেটি খুবই উপরের মহলের জন্য; সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, দেবী দুর্গার তো বটেই।

অবশ্য ধনীদের প্রবর্তিত এই আধুনিকতা বৃহত্তর ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবেশ করে নি। তার কারণ, প্রথমত, এই-সমস্ত আমোদপ্রমোদ প্রচুর-ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই ব্যয়ভার বহন করা প্রায় সকলের পক্ষেই ছিল সাধ্যাতীত। দ্বিতীয়ত, প্রকাশ্যে স্ত্রী-পুরুষে নাচানাচি বা মাতামাতি বাঙালি মধ্যশ্রেণীর কনজারভেটিভ মন গ্রহণ করতে পারে নি। কারণ-বারিটা অবশ্য সমাজে প্রবেশ করেছিল, তবে প্রকাশ্যে নয়, পূজা উপলক্ষে তো নয়ই। যাই হোক, ধনীদের এই আধুনিকতা কোনো দিন স্থায়ী হয় নি।

এই সময়ে কলকাতার ধনীরা আর-একটি নতুন আধুনিকতায় মেতে উঠলেন। ব্রিটিশ সরকার প্রথমত ব্যাবসার প্রয়োজনে, এবং দ্বিতীয়ত, সুশাসনের প্রয়োজনে, রেলগাড়ির প্রবর্তন করল। তখনই শরৎ-

কালে পুজোর ছুটিতে "হাওয়া বদলানো"র হাওয়া লাগল ধনী-মহলে। যাঁদেরই পয়সা ছিল তাঁরাই রেলগাড়িতে চড়ে কাছে-দূরে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়তেন। এই নতুন আধুনিকতা ধনী-সমাজ থেকে উচ্চমধ্যবিত্তদের ভেতরও ছড়িয়ে পড়ল দিনে-দিনে।

ততদিনে এদেশে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একটা সমাজ ভালোভাবেই গড়ে উঠেছে। এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সমাজই তখন বাঙলার সংস্কৃতি তথা শিক্ষাদীক্ষার ধারক-বাহক। বস্তুবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্ত্য এথিক্‌স্ আর ঈস্‌থেটিক্‌স্ শিক্ষিত মানুষের মনকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। নতুন মূল্যবোধ দেখা দিয়েছে জীবনে। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত কিছু-কিছু শিক্ষিত যুবকের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হল। ইউরোপের দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি তাঁদের চোখ খুলে দিল। অধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তার মূল এইখানেই। ইউরোপীয় সন্ত্রাসবাদ আর বিদ্রোহের কাহিনীতে অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যশ্রেণীর এইসব শিক্ষিত যুবকদের উদ্যমেই বাঙলায় সন্ত্রাসবাদের সূচনা। কেবল সন্ত্রাসবাদ নয়, সমগ্র জনসমাজকে স্বাধীনতাসচেতন করার প্রয়োজনও এঁরাই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। সবচাইতে বেশি প্রয়োজন ছিল তরুণ এবং কিশোরদের জাতীয়তার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করা। বিপ্লববাদীদের খুবই গোপনে সংঘবদ্ধ হতে হত পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য। তাঁদের খেয়াল হল, ইংরেজ হিন্দুদের পূজা-অনুষ্ঠানকে হাস্যকর পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই মনে করে না, এবং এইসব ব্যাপার নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তাই এই পূজাকে আবরণ হিসেবে নিয়ে ছেলেদের সংঘবদ্ধ করার এবং গোপনে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করার একটা সহজ উপায় তাঁরা খুঁজে পেলেন।

এদের সংঘবদ্ধ করে প্রথমে এই নিরীহ পূজার কাজেই লাগাতে হবে! এইভাবেই প্রথমে সার্বজনীন পূজার প্রচলন হল। এর প্রধান উদ্যোক্তা ইস্কুল-কলেজের তরুণের দল। তবে পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসতেন। স্থানীয় অবস্থাপন্ন মানুষরাও সমর্থন জানাতেন। তার একটা বড়ো কারণ, ধনীদের পূজার আড়ম্বর, অঢেল ঐশ্বর্যের আস্ফালন এবং অহমিকা দেখে যথার্থত শিক্ষিত অনেক ভদ্রলোকই বিরক্ত হতেন, তাই এই সার্বজনীন পূজার আয়োজনে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসতেন। ছোটো-ছোটো ছেলেরা পূজাপ্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবক হত। নিয়মানুবর্তিতা ভাঙতেই যারা অভ্যস্ত তাদের ওপরই ভার পড়ত নিয়মরক্ষার। বড়ো ছেলেরা, যুবকেরা পূজার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাব পালন করত। পুরোহিত হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রপাঠ করতেন। সকলে শুদ্ধমনে অঞ্জলি দিত। মেয়েদের অঞ্জলি দেবার থাকত বিশেষ ব্যবস্থা। সেই থেকেই সার্বজনীন পূজার রীতি বাঙালি সমাজে বহাল হল—দুর্গা বড়োলোকের দালান ছেড়ে সর্বসাধারণের আঙিনায় নেমে এলেন। এই পূজায় ঐশ্বর্যের আস্ফালন ছিল না, কথায়-কথায় পয়সা উড়ত না। পূজাপ্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের মনে হীনম্মন্যতার ভাব আসত না। মানুষে-মানুষে একটা আন্তরিকতার বোধ জাগত। এই পূজায় যেন "সবাই রাজা"।

যে বিপ্লববাদীদের অনুপ্রেরণায় এই সার্বজনীন পূজার শুরু, তাঁদের সান্নিধ্যে এসে তরুণ উদ্যোক্তাদের মনোজীবনের বিশেষ উন্নতি দেখা দেয়। এই বিপ্লবপন্থীরা ব্যক্তিগত জীবনে পূতপবিত্র সন্ন্যাসীর মতো ছিলেন। এঁদের নির্লোভ নির্মল চরিত্র, একান্ত পরার্থপরতা, এবং সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মানুষকে আকর্ষণ করত। বিপদসঙ্কুল পথের অভিযাত্রী এইসব মৃত্যু-ভয়হীন মানুষের সংস্পর্শে এসে পূজার তরুণ উদ্যোক্তারা একটা আদর্শ জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হত। ফলে, সার্বজনীন পূজার সমস্ত আয়োজনটি সুন্দর পবিত্র শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠত। আনন্দের উল্লাস অশালীন কাণ্ডকারখানায় পরিণত হত না—অকারণ চেঁচামেচি বা উৎকট সংগীতের রাসভনিন্দিত কণ্ঠস্বর

পুজাপ্রাঙ্গণকে উৎপীড়ন করত না।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি তথ্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। রবার্ট ক্লাইভ যেদিন সুবে বাঙলার অবিসংবাদী প্রভু হয়ে উঠলেন, তার থেকে প্রায় ১৫০ বছর পরে কলকাতায় এই সার্বজনীন দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। তার অনেক আগেই শিক্ষিত হৃদয়বান মানুষের প্রাণে দেশমাতৃকার পরাধীনতার বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। কখন যেন অজানিতে বাঙালির মনে দেশমাতৃকা আর মা দশভুজা একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। অহিফেনসেবী কমলাকান্ত চক্রবর্তীর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

"বন্দেমাতরম" গানটি রচনার পর সার্বজনীন পূজা যাঁদের পরিকল্পনা তাঁরা এই গানের কলি কণ্ঠে নিয়েই ফাঁসির মঞ্চে উঠে ফাঁসির রজ্জুকে ফুলের মালার মতো গলায় পরেছেন। তাই সেদিনের দুর্গাপূজার অন্যরকম একটা মহিমা ছিল। দেবীর আবাহন ছিল যেন দেশমাতৃকাবন্দনারই একটা প্রতীক। বিসর্জনের দিন সানাইয়ের করুণ বিলাপে অধীন জাতির বেদনাই ধ্বনিত হয়ে উঠত।

প্রাক-স্বাধীনতার দিনগুলি পর্যন্ত দুর্গাপূজার এই ঐতিহ্যই মোটের উপর বহাল ছিল।

দেশ স্বাধীন হল—ইংরেজ আর প্রভু থাকল না। তখন থেকে ইংরেজের অনুকরণ আর "স্লেভ মেনটালিটি" রইল না। বরং সাহেবিয়ানা করাটাই হল আধুনিকতা। বাঙলা ভাষা, বাঙালিয়ানা—এসবই মুহূর্তে প্রাগৈতিহাসিক হল। অবস্থা একটু সচ্ছল হলেই সব বাপ-মায়েরাই সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়মে ভরতি করাবার জন্য আকুল। বাঙলা না-জানাটা এমন গর্হিত অপরাধ কিছু নয়, কিন্তু ইংরেজি বলতে না-পারা—এর চাইতে লজ্জার আর কিছু নেই।

এই এলিট সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের পূজায় উৎসাহের একমাত্র কারণ নতুন জামাকাপড়, আর পুজোর ছুটিতে বিদেশভ্রমণ। "পুজোর ছুটিতে কলকাতা! ওঃ, অ্যাবসার্ড!" তাদের বাপ-মায়েরও একই মনোভাব। নিম্নমধ্যবিত্তরাও যতটা সম্ভব এদেরই অনুকরণে ব্যস্ত।

এই আধুনিকতার তোড়ে আধুনিক বাঙলাদেশ থেকে কি তুলে দিতে হবে পুজোকে?

না, তুলে দিতে হবে কেন? দুর্গাপূজা তো ধর্মও নয়, ধর্মাচরণও নয়। যদি ধর্ম হত, ধর্মাচরণ হত, তাহলে অবশ্য ভাবতে হত। কারণ, ধর্ম, ধর্মাচরণ তো অহিফেন। অহিফেনসেবন কোনোমতেই সমর্থনীয় নয়। দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এত হইহই করবার, ফুর্তি করবার একটা সুযোগ, এবং উদ্যোক্তাদের পক্ষে একটু অধিক রাত্রে নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করবার অবসর। অবশ্যই সে আনন্দের বায়ভার বহন করবে চাঁদা-করে-তোলা পুজা তহবিল।

অধুনাতম দুর্গাপূজার একটি ছবি এঁকে নিবন্ধের ইতি করা যাক।

সেকালে দেবীর আগমনবার্তা সর্বপ্রথম ঘোষণা করত মেঘমুক্ত আকাশের সোনালি রোদ আর শারদ প্রাতের স্নিগ্ধ বাতাস। একালে সেই সংবাদ জানবার জন্য প্রকৃতির দিকে তাকাতে হয় না। কারণ, শহর কলকাতায় প্রকৃতি বলে তো কিছু নেই। "পূজা আসছে"—একথা জানা যায় বস্ত্রব্যবসায়ীদের চটকদার বিজ্ঞাপন থেকে। টুরিসট এজেনসির মনভোলানো বিজ্ঞাপন থেকে। পাতার পর পাতা জুড়ে এইসব বিজ্ঞাপনের সমারোহ।

তারপর, গৃহস্থ ত্রস্ত হলেন, ছোটো ব্যবসায়ী প্রমাদ গুনলেন, ধনী ব্যবসায়ী মুচকি হাসলেন। মস্তান ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল চাঁদার খাতা হাতে।

সার্বজনীন পূজার আদিযুগে উদ্যোক্তা ছিল ইস্কুল-কলেজের চরিত্রবান ছেলেরা, পাড়ার সৎ যুবকেরা—যাদের জীবনে আদর্শ ছিল, দেশকে যারা ভালোবেসেছিল, গভীর আত্মসম্মানবোধ যাদের জীবনের প্রতি পদে সহায়ক ছিল। কিন্তু তারা তো এখন কোথাও নেই। আজকের সমাজে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে—তারাও ফুরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। আজকের যুগে যুবসম্প্রদায়ের নেতা মস্তানরা। আদিযুগে যেন বিপ্লববাদী দাদাদের উৎসাহেই সার্বজনীন পূজার শুরু, এযুগে তেমনি মস্তানদের উৎসাহদাতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাদারা। কিন্তু দাদায়-দাদায় যে অনেক তফাত। সেকালের দাদারা ছিলেন সর্বহিতে ব্রতী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী; আজকের দাদারা যে কী, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই, তাঁদের উৎসাহপুষ্ট তরুণরা স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন চরিত্রের।

আজকের পূজার চরিত্রও তাই ভিন্ন ধরনের। আধুনিক।

শত-শত বছরে যা হয় নি, চল্লিশ বছরের স্বাধীনতায় তা সম্ভব হয়েছে। দুর্গার রূপটাই সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেই আকর্ণবিস্তৃত পদ্মপলাশ লোচন আর নেই, যে চোখে বিদ্যুৎবহ্নি আর বরাভয় একই সঙ্গে বিরাজ করত, তাও নেই। দেবীর মুখের আদলে ফুটে ওঠে চলচ্চিত্রনায়িকার মুখ, সরস্বতী যেন আধুনিক কলেজগামিনী তরুণী, লক্ষ্মীর চক্ষুতে কটাক্ষ, কার্তিকের গুম্ফহীন মুখাবয়ব অমিতাভ বচ্চনের দোসর। কেবল গণেশঠাকুরকে কিছু করা যায় নি। তবে অসুর যেন বোমবাই ছবির ভিলেন।

পুজাপ্রাঙ্গণে নরনারীর ভিড়। কিন্তু তারা বাঙালি কিনা বোঝবার উপায় নেই। তাদের পরনে হয় ট্রাইজার আর বুশশার্ট, নয় পায়জামা আর লখনউ পানজাবি। মহিলাদের ভিতর শাড়ি-পরিহিতা কিছু আছেন, কিশোরী তরুণীদের অধিকাংশই হয় ম্যাকসি, নয় কুরতা আর শালোয়ার। শিশুদের সাজানো হয় রঙবেরঙের বাবা-স্যুটে। বাঙালির পূজাপ্রাঙ্গণে বাঙালি নেই। কেবল পুরোহিতের পরনে ট্রাউজার বা পায়জামা নেই। যেদিন তিনি ট্রাউজার আর বুশশার্ট পরবেন, সেদিন আধুনিকতার ষোলকলা পূর্ণ হবে।

আর-এক দিকে রেকর্ডপ্লেয়ার অথবা টেপ-রেকর্ডারে অবিরাম চলেছে হিন্দি ছবির প্রেমসংগীত, নয়তো বাঙলা লঘু সংগীত "বড়লোকের বিটি লো…"

গত বছর মসকো থেকে এক রবীন্দ্রভক্ত এসেছিলেন। সেখানে তিনি বাঙলা ভাষার অধ্যাপক। দুর্গাপূজা দেখার শখ। আমার ওপর ভার পড়েছিল তাঁকে পুজাপ্রাঙ্গণ দেখাবার। বিস্ফারিত নেত্রে সব তিনি দেখলেন। বিদায় নেবার সময় বললেন, "But here are a pack of Eurasians, scandalously dressed, speaking horrible English in their native accent. Where have the Bengalis gone?"

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারি নি।

অগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত "অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যু" প্রবন্ধে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন, এই অনুরোধ।

পৃষ্ঠা	কলম	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৩	২	১২	জুড়ে	মুড়ে
৩০৪	১	৩৮	সেদিকে	যেদিকে
৩০৬	২	৩	ক্ষোভে	ক্ষোভে দুঃখে
৩০৭	১	৫	'ব্রাহ্মসঙ্গীতে'	'ব্রহ্মসঙ্গীতে'
	২	৯	সাণ্টা কে	সাণ্টা ফে
		১০	ডেনভাব	ডেনভার
		১৮	বিয়াল্লিস	বিয়াল্লিশ

গ্রন্থসমালোচনা

সমর সেনের সম্মানে

The Truth Unites : Essays in Tribute to Samar Sen.
Edited by Ashok Mitra, Subarnarekha. Pp. 316. Rs. 180.00

সমর সেন বিরল কয়েকজন কবির মধ্যে একজন যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অবস্থায় সচেতন সিদ্ধান্তে কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। সে সিদ্ধান্তে যখন আসেন তখন ওঁর বয়স তিরিশ, আর কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতা কমে এসেছে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। যেমন দেখা যায় নি শিক্ষানবিশের লক্ষণ প্রথম যখন ১৯৩৪ সালে আঠারো বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন। থামিয়ে দেন বারো বছর পরে। সমর সেনের কাব্যজীবনের আয়ু যেমন কম, তাঁর সমগ্র কবিতার সংখ্যাও কম। এত কম কবিতা লিখে বাঙলা কাব্যসাহিত্যে স্থায়ী জায়গা পেতে, আর এক জোরালো কাব্যরীতির প্রবর্তন করতে আর কোনো কবি পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

কবিতা লেখা বন্ধ করার পর সমর সেন নানা কাজ করেছেন—বেতার বিভাগে, সংবাদপত্রে, এখানে-ওখানে। ১৯৬৪ সাল থেকে আজ অবধি প্রথমে "নাউ" আর পরে "ফ্রনটিয়ার" সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন। "নাউ" আর "ফ্রনটিয়ার"-এ কতটা লিখতে হয়েছে বা হয়, সঠিক জানার উপায় নেই, কিন্তু বাঙলায় প্রায় চল্লিশ বছরে কয়েকটি ছোটো প্রবন্ধ আর ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী "বাবুবৃত্তান্ত" ছাড়া কিছু লেখেন নি।

যিনি কবিতা লিখেছেন কম আর তা থেকে বিরত থেকেছেন চল্লিশ বছর, এবং গত কুড়ি বছরে নিজের সম্বন্ধে একটি 'প্রাথমিক খসড়া' ছাড়া দুটি স্বল্প প্রচারিত, মূলত রাজনৈতিক, সাপ্তাহিকের আড়ালে থেকেছেন, তাঁকে বা তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং সম্পাদনার কাজ ভুলে যাবার প্রবণতা আজকের যুগে স্বাভাবিক, বিশেষ করে সমর সেন নিজে যখন আত্মপ্রচার দূরে থাক, আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থেকে মুক্ত। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞ হওয়ার দায় আমাদের চলে যায় না। সমর সেনের সাহিত্যকর্ম বা ওই দুই ইংরেজি সাপ্তাহিকের মতো পত্রিকা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদনা আর প্রকাশনার প্রায় অসাধ্যসাধন ছাড়াও ওঁর অনুচ্চার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট বহু গুণগ্রাহী এই দায় পালন করা হয় নি বলে মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করেছেন। সেই দায় এবং বোধ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন ড. অশোক মিত্র "The Truth Unites" প্রবন্ধসংকলন বার করে। এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার পরিমাপ আমাদের কম নয়।

বইটির প্রচ্ছদে বলা আছে, এই প্রবন্ধসংকলনে সম্পাদকীয় ভূমিকা ছাড়া আঠারোটি প্রবন্ধ আছে। ভূমিকায় ড. অশোক মিত্র লিখেছেন, এত বিভিন্ন বিষয় আর লেখকের সমাবেশ পাঠকের প্রথমে আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি সমর সেনের গত পাঁচ দশকের আপাতদৃষ্টিতে খেয়ালি পরিক্রমণের কথা মনে রাখা যায়, আর এই বিভিন্নতাই সমর সেনের গুণগ্রাহীদের বিস্তৃত বলয়ের পরিচয়। এই মত এবং উক্তির যাথার্থ্যে প্রশ্ন করার অবকাশ নেই। কিন্তু গ্রন্থের উদ্দেশ্য মনে রেখে বিভিন্ন প্রবন্ধের সামগ্রিক ঝোঁকটা দেখলে একটু বিস্মিত হতেই হয়।

কারও সম্মানে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই ঠিকই, কিন্তু একটা অলিখিত রীতি আছে। যাঁর সম্মানে প্রবন্ধ লিখিত এবং সংকলিত, সেইসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সেই ব্যক্তি না হলেও, তাঁর কাজ বা আগ্রহের এলাকায় পড়ে এমন বিষয় নিয়ে রচিত হওয়াই সেই রীতি। সমর সেনের উৎসাহ আর আগ্রহ খুবই সম্ভব অনেক বিষয়ে আছে, কিন্তু সাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় কবি হিসাবে, বামপন্থী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে, এক অসামান্য ব্যক্তি হিসাবে। "বাবুবৃত্তান্ত" থেকে জানা যায় তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী কখনও ছিলেন না, আর জীবনে পাণ্ডিত্য অর্জন বা তত্ত্বচর্চায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, তাও নয়। পাঠকের কাছে সুতরাং এটা প্রত্যাশিত ছিল যে অধিকাংশ প্রবন্ধর বিষয়বস্তু সমর সেন, তাঁর সাহিত্য-কর্ম, দেশের সমকালীন অবস্থায় "নাউ" এবং "ফ্রনটিয়ার" সাপ্তাহিক দুটির ভূমিকা যদি নাও হয়, তা অন্তত হবে এসবের সংশ্লিষ্ট বিষয়। আঠারোটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর উল্লেখে দেখা যাবে, তা হয় নি। মাত্র একটি প্রবন্ধে (A Way of Putting It) অশোক মিত্র (সম্পাদক নন) ব্যক্তি সমর সেন আর তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর দুটি আছে

(M.J. Akbar-এর Notes on a Non Fraud আর M. S. Prabhakar-এর Reconsidered Passion) —সমর সেনের প্রতি স্বল্পায়তন শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রবন্ধ। কবিতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ আছে যাতে লেখক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মীদের চেতনা আর অভিজ্ঞতার মিশ্রণ কিভাবে কবিতায় প্রতিফলিত হয়ে একই সঙ্গে সংগ্রামের হাতিয়ার আর সার্থক কাব্য সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া দুটি লেখা (মালিনী ভট্টাচার্যর Realism and Resistance in the Marxist Cultural Movement আর জি. পি. দেশপাণ্ডের The Indian Artist and The Long Revolution) শিল্প-সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। বাকি বারোটি প্রবন্ধর বিষয় হল অর্থনীতি, ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ।

বিষয়ের বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনই লক্ষণীয় অধিকাংশ প্রবন্ধের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গাম্ভীর্য। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রণজিৎ গুহ তাঁর প্রবন্ধ The Career of an Anti-God-এ রাহু ও গ্রহণের ধর্মীয় অনুশাসন আর লোকাচারের বিশ্লেষণ এবং তাৎপর্য আলোচনা করেছেন সমাজনীতির এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমলেন্দু গুহ আমাদের কৃষিবিদ্রোহের এক বিগত অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন Neo-Vaishnavism to Insurgency : Peasant Uprisings and the Crisis of Feudalism in Late Eighteenth-Century Assam প্রবন্ধে। পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ প্রবন্ধের শিরোনাম On the Problematic of the State as Capitalist and Its Significance for the Third World : An Essay in the Critique of Political Economy। রণজিৎ সাউ এবং অমিত ভাদুড়ীর আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে The Crisis of Economic Theory এবং Profits in a Capitalist Economy। এন কৃষ্ণজী লিখেছেন The Importance of Foodgrain Prices নিয়ে, আর নির্মল চন্দ্রর বিষয় হল Peasantry as a Single Class.

অর্থনীতির আওতায় পড়ে এমন বিষয়ের আধিক্য শুধু যে এই সংকলনগ্রন্থর ভারসাম্য ব্যাহত করেছে তা নয়, চার-পাঁচটি বাদ দিলে বাকি সব প্রবন্ধই মনে হয় বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা। পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় ৪০টি উদ্ধৃতি আর মতামতের মূলসূত্রের নির্দেশ ছাড়াও ইংরাজি, জারমান, ফরাসি আর রাশিয়ান ভাষায় পঠিতব্য বই ও পত্রিকার যে সংযোজন প্রবন্ধের শেষে তিনি দিয়েছেন, তার সংখ্যা হল ৫৮। Lawrence Lifschultzও তাঁর প্রবন্ধ The Emergence of American Capital-এ প্রতিপাদ্যের সপক্ষে স্বতন্ত্র সংযোজনে উল্লেখ করেছেন ১০০টি সূত্রের। এইসব প্রবন্ধের লেখকরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, খ্যাতিমান ব্যক্তি। তাঁদের পাণ্ডিত্য নিঃসন্দেহে তাঁদের লিখিত প্রবন্ধের উচ্চমান এবং জ্ঞানগর্ভতার নিদর্শন। কিন্তু তাতে আর যাই হোক, লেখায় স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করে নি।

অশোক মিত্র কি ঠিক এই চেয়েছিলেন সমর সেনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রবন্ধসংকলন সম্পাদনা করতে? ভূমিকা পড়ে তা মনে হয় না। সেখানে সেই কথাটাই নতুন করে বলেছেন যা ১৯৬৮ সালে সমর সেন সম্পর্কে 'ওর স্থূলে ভুল নেই' প্রবন্ধে লিখেছিলেন। সে প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'যিনি স্বীয় অবৈকল্য নিষ্ঠা দিয়ে সাংবাদিকতার মান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বহু উর্ধ্বে তুলে নিয়ে গেছেন' তাঁর কবিতা আর প্রত্যয়ের অপরিমিত সাহসের কথাই লিখেছিলেন। সেই কারণে যদি সমর সেনের গুণগ্রাহী সাধারণ পাঠক The Truth Unites-এ কিছু অন্তত অন্যভাবে লেখা অন্য ধরনের প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ পাবেন বলে আশা করে থাকেন, এবং কিছুটা নিরাশ হন, তা অযৌক্তিক নয়। সন্দেহ হয়, বাঙলা সাহিত্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাসংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রত্যাশিতভাবে না থাকার জন্য সম্পাদক সম্পূর্ণ দায়ী নন। খুবই সম্ভব যে অনেকে, যাঁদের এই সব বিষয়ে লেখার অধিকার এবং ক্ষমতা আছে, তাঁর অনুরোধে সাড়া দেন নি।

সাধারণ পাঠকের প্রত্যাশা মেটে না বলেই অবশ্য এই সংকলনগ্রন্থের অসামান্যতার হানি হয় না। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রে বাঁধা বেশিরভাগ প্রবন্ধ অধ্যয়ন তথা মননের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিন্তাশীল, বিশেষ করে মার্কসীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণী পদ্ধতি ও শাখা-প্রশাখায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংকলন বলে আদৃত হবে।

কিরণময় রাহা

মুসলিম জাগরণে সাহিত্য-সমাজ

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম—খোন্দকার সিরাজুল হক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। একশত টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে জাগরণের ঢেউ উঠেছিল তা আজ নানা কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এসব কারণের ভেতর একটা হল তৎকালীন বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ঔদাসীন্য। এই ঔদাসীন্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে কখনো বিবেচনায় আনা হয় না, তা হল, যে হিন্দু সমাজ এই জাগরণের প্রধান হোতা, তাদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন এমন মুসলমান নেতা সেদিন ছিলেন না। তাঁদের অস্তিত্ব সরব হয়েছে আরো পরে। প্রকৃতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মুসলিম-মানস এ-জাতীয় জাগরণের মুখোমুখি হবার স্পর্ধায় জোরদার হয়ে ওঠে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর কোনো স্তরেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। যাঁদের পাওয়া যায় তাঁরা সমাজের উচ্চস্তরের লোক অথবা নীচের স্তরের। এই স্তর-বিন্যাসের প্রধান ত্রুটি হল, শ্রেণীচেতনা সেদিন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৬-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখকে ঘিরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু তাতে সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা, উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও কোনো ভূমিকা ছিল না। এই শ্রেণী সচল হয়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বঙ্গভঙ্গজনিত কারণে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধে। এই উভয়বিধ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাতে একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় (এলিট) গড়ে ওঠে—যাঁরা ১৯২৬ সালে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" নামে এক প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আত্মপ্রকাশ করেন। এঁদের মটো ছিল বুদ্ধির মুক্তি। "শিখা" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁদের কার্যক্রম বিকশিত এবং বিস্তারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দলটিকে মুসলিম জাগরণের দূত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়—যদিও তাঁদের কার্যক্রম কোনোপ্রকার সাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। এই কারণে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" নাম হলেও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু অ-মুসলমানও জড়িত ছিলেন—যদিও তাঁদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল মুসলিম চিন্তা এবং চেতনাকে ঘিরে।

আজ আমরা যখন বাঙলার জাগরণের কথা বলি, তখন অনেক সময়ই তাদের কথা স্মরণ করি না। শুধু তাই নয়, তাঁদের অস্তিত্বও ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আজ এঁদের অনেককে আমরা জানি সাহিত্যিক হিসেবে। কিন্তু তাঁরা যে একটি অসাধারণ নীতির ধারক, সেকথা আমরা মনে রাখি না। প্রধানত এই মনোভাব থেকেই আলোচ্য গবেষণাকর্মটি প্রণীত। সমকালীন হিন্দু লেখকদের এসব ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনীহাই তার প্রেরণামূল। "পূর্বকথা"-শীর্ষক আলোচনায় তিনি কলকাতার "কল্লোল" পত্রিকার সঙ্গে ঢাকার "শিখা"র তুলনা করেছেন। সাহিত্যবিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই তুলনা যত অসঙ্গত হোক না কেন; মুসলিম-মানস নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁদের দান যে অসাধারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে হিসেবে বিবেচনা করলে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। লেখক ডক্টর খোন্দকার সিরাজুল হক এই গ্রন্থে এই আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবদ্ধ ইতিহাস বিবৃত করেছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়।

এই সুবৃহৎ গবেষণাগ্রন্থটিকে লেখক চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথমেই ভূমিকা-নামক একটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক পটভূমি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় ৮০ পৃষ্ঠার এই ভূমিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের নানাদিক আলোচিত হয়েছে—যাতে যুগপৎ তাদের সবলতা এবং দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এর একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিম-রচিত বাঙলা গদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস। এর পরের অধ্যায়ে রয়েছে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান ও "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"। এই অধ্যায় পাঠ করে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের ইতিহাস তো জানা যাবেই, উপরন্তু তার সঙ্গে জানা যাবে এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে মুসলমানদের উদ্যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজে"র সমাজচিন্তা। এই চিন্তা যেসব অবলম্বনকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে

সেগুলো হল মাতৃভাষা, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক সমস্যা, ললিতকলার চর্চা, এবং ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়টিতে মুসলমান সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বিধৃত। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"-কর্মীদের সাহিত্যকর্ম। সমাজের এসব কর্মী হলেন কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮); কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০); আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮); কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১); মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬); আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)। খোন্দকার সিরাজুল হক এসব ব্যক্তি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলো যথাযথ তুলে ধরেছেন। এসব লেখক সম্পর্কে এত তথ্য এর আগে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

এই গবেষণাগ্রন্থের যেসব বৈশিষ্ট্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেগুলো হল তথ্যের অপর্যাপ্ততা—যা যেকোনো গবেষণাগ্রন্থের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। লেখক বহু দুর্গম স্থান থেকে তথ্য আহরণ করে তা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও তথ্যের দিক দিয়ে তাঁকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হতে পারে। এ ছাড়া তিনি গ্রন্থের শেষে একটি মূল্যবান পরিশিষ্ট সংযোজন করেছেন, তাতে রয়েছে (ক) "শিখা" পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র; "শিখা"-গোষ্ঠীর লেখকদের রচনার পূর্ণাঙ্গ তালিকা; একটি বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি এবং কিছু দুষ্প্রাপ্য চিত্র। এসব চিত্র হল 'অভিযান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার ছবি; 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের কার্যসূচি; "শিখা"র মুখপাতের ছবি এবং "শিখা"র প্রকাশকের নিবেদন। এই গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গবেষকের ভাষা। এমন নিটোল নির্ভাজ গদ্যশৈলী একটি গবেষণাকর্মের প্রাথমিক শর্ত—যা এই গ্রন্থের আগাগোড়া বিদ্যমান।

গ্রন্থটির কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এসব ত্রুটি লেখক ইচ্ছে করলেই সারতে পারতেন। যেমন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মীর মশাররফ হোসেনের "রত্নবতী" (১৮৬৯)-কে "আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য-প্রভাবপুষ্ট প্রথম বাংলা গদ্য রচনা" বলে উল্লেখ করেছেন। তার উপর ভিত্তি করে লেখক "রত্নবতী দিয়েই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের যাত্রা শুরু" বলে মন্তব্য করেছেন (১০ পৃ.)! এভাবে মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের উক্তি সমর্থন করা তাঁর উচিত হয় নি। কারণ, এই গ্রন্থে প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাবের লেশমাত্রও নেই। তিনি একই পৃষ্ঠায় বলেছেন, "কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালী মুসলমান লেখকদের ছাপ স্ব-সম্প্রদায়ের বাইরে বিশেষ প্রসারিত হয়নি।" একথাও নির্বিচারে মেনে নেওয়া যাওয়া যায় না, কারণ নজরুলের আবির্ভাবের আগে রচিত উপন্যাসে মুসলমানদের দৃষ্টি সম্প্রদায়ের বাইরে প্রসারিত হয়েছিল। অধুনা এসব উপন্যাসের অনেকগুলোই আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি মন্তব্য করেছেন, "তাঁর [হাজী শরিয়তুল্লাহ] অনুসারীরা জুমা ও ঈদের নামাজ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ রাখে" (২০ পৃ.)। এই তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন উল্লেখ করলে ভালো হত।

কখনও-কখনও তাঁর দেশকাল-সংক্রান্ত চিন্তা খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ মনে হয়, যা সঠিক অবস্থা উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, তিনি বলেছেন, "মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নওয়াব আবদুল লতীফের আরেকটা বড় অবদান হলো মহসীন ফাণ্ডের অর্থের সদ্ব্যবহার করা" (২৭ পৃ)। এস্থলে সদ্ব্যবহার শব্দটি বিভ্রান্তিকর। কারণ "এ-ফাণ্ড একজন মুসলমানের অর্থে গঠিত" হলেও তা "মূলত মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট" একথা ঠিক নয়। এ ফাণ্ড সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্যে প্রদত্ত হয়েছিল। লেখক স্যার সৈয়দ আহমদের মুসলিমপ্রীতির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এই প্রীতির আড়ালে যে তিনি প্রবল বাঙালি-বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কোথাও উল্লেখ করেন নি। ১৮৮৭ সালে লখনউতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এই বিদ্বেষের কথা স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনার সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর প্রসঙ্গ হলো বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ। কারণ বঙ্গভঙ্গের আলোচনা একতরফা। তিনি এক্ষেত্রে "অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক অবস্থার কথা" বিবৃত করেছেন, কিন্তু কোথাও এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় কেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল তা যেমন কোথাও স্পষ্ট নয়, তেমন সার্বিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ক্ষতিকর দিকটিও যথাযথ পর্যালোচিত নয়।

আমার বিশ্বাস, এই প্রসঙ্গটি এত জটিল এবং সুদূরপ্রসারী-প্রভাবপূর্ণ যে, তার সব দিক আলোচিত হওয়া বিশেষ দরকার। এই প্রস্তাবটিকে নিছক আর্থিক সুযোগ-সুবিধে দিয়ে বিশ্লেষণ করে, তার গুণাগুণ নির্ধারণ করে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা না হলে পরিণামে তা অন্ধের হস্তিদর্শনে পর্যবসিত হবে। তার প্রমাণ মুসলিম লীগ গঠন প্রসঙ্গে লেখকের পর্যবেক্ষণ। তিনি বলেছেন, "ইতোমধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বরে নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রচেষ্টায় এবং নওয়াব ভিকার-উল-মুলকের (নওয়াব মুসতাক হোসেন) সভাপতিত্বে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে" (৮৩ পৃ)। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা কি এত সহজেই হয়েছে? এতে এই প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নরের প্রত্যক্ষ সমর্থন তথা প্ররোচনার কথা ব্যক্ত না করায় গোটা পরিস্থিতিরই অবমূল্যায়ন হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিষয়টিকে এত সরলভাবে উপস্থিত না করে তার সবদিক খুঁটিয়ে দেখা উচিত ছিল।

এই গ্রন্থের সর্বাধিক বিরক্তিপূর্ণ দিক হল তার কলেবর। এই কলেবরের জন্যে প্রকৃতপক্ষে দায়ী লেখকের উদ্ধৃতি বাহুল্য। নানাভাবে এসব উদ্ধৃতি গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তির একই কথা বার-বার উদ্ধৃত করার ফলে তা কলেবরবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, একজন লেখকের লেখা একবার তিনি নিজে বলেছেন, আবার তার উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। সমাজ চিন্তা বর্ণনার সময় ব্যবহৃত উদ্ধৃতি তিনি সহজেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। কারণ সমাজচিন্তা উপলব্ধির জন্যে লেখকের বর্ণনাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

যা হোক, এসব ছোটোখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

রশীদ আল ফারুকী

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ [১৮৫৭—১৯০৫]—মুনতাসীর মামুন। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮+৩৩৮। মূল্য একশ টাকা।

মুখবন্ধ আর ভূমিকা নিয়ে বইটির চারটি অধ্যায় : ১) পূর্ববঙ্গ : চিহ্নিতকরণ, ২) ঔপনিবেশিক সমাজগঠন ও শ্রেণীবিন্যাস, ৩) সামাজিক আন্দোলন : প্রতিক্রিয়া ৪) জনমত : সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির উদ্ভব ও বিকাশ। বইটিতে চার পৃষ্ঠার একটি উপসংহার ছাড়াও সংযোজিত হয়েছে তিনটি পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জী এবং নির্ঘণ্ট।

মুনতাসীর মামুন লিখছেন—'এই গ্রন্থে আমার প্রয়াস হচ্ছে, পূর্ববর্তী গবেষকদের মতো, খণ্ডিত বা সম্প্রদায়গত ভাবে সমাজ বিচার না করে, সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের সমাজগঠন বিশ্লেষণ করা' [পৃ ৫]। আর এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি একের পর এক উল্লেখ করে গেছেন অন্য লেখক বা গবেষকদের ত্রুটি কোথায়, ভ্রান্তির কোন্ পথ বেয়ে তাঁরা কিভাবে অপরিণত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

তথ্যের প্রাচুর্য আছে আবদুর করিমের গ্রন্থে কিন্তু তাঁর রচনা প্রধানত বর্ণনামূলক [পৃ ৩]। আবদুর রহিম-এর গ্রন্থও বিশ্লেষণ অপেক্ষা তথ্যে আকীর্ণ। এবং করিমের মতোই শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর আলোচনা স্বচ্ছ নয় [পৃ ৩]। বা আজিজুর রহমান মল্লিক, আনিসুজ্জামান, সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং সুফিয়া আহমদ-এর গ্রন্থগুলি বা "অধিকাংশ গবেষকই" সামগ্রিকভাবে সমাজকে বিচার না করার ফলে তাঁদের ইতিহাস হয়েছে খণ্ডিত, অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ইতিহাস মাত্র [পৃ৪], এবং ঔপনিবেশিক সরকার তার শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর দ্বারা। কিন্তু কিভাবে? পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা তা উল্লেখ করেন নি [পৃ ১৩]। মুনতাসীর মামুন আরো উল্লেখ করেছেন— নির্দিষ্ট একটি সমাজ গঠনের চরিত্র নির্ধারণ করে ঐ সময়ের প্রধান উৎপাদনপদ্ধতি [পৃ ৫]।

এই প্রেক্ষিতে আমরা যখন তাঁর গ্রন্থটি পড়তে এগোই তখন আশা জাগে উল্লেখ্য ত্রুটি আর ভ্রান্তি পেরিয়ে লেখকের পরিণত বিশ্লেষণের একটি গ্রন্থ আমরা পাব। এবং লেখকের রয়েছে এমন এক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে তিনি উৎপাদনপদ্ধতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের স্তরগুলো স্পষ্ট করে তুলতে পারবেন। পারবেন আলোচিত সময়ের নির্দিষ্ট সমাজের স্পষ্টতর একটি বিশ্লেষণ করতে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, ১১৩টি তথ্যনির্দেশ দিয়ে তিনি যে গ্রন্থটি শেষ করেছেন তা কিভাবে মেনে নেব। 'তথ্যের প্রাচুর্যে আকীর্ণ' নয়। আর আগেই আবদুর রহিম বা অন্যান্য গবেষকদের গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের নির্দিষ্ট অভিযোগ যেখানে রয়েছে। এবং কেনই বা তাঁর গ্রন্থটি 'বর্ণনামূলক' না বলে 'বিশ্লেষণাত্মক' ভাবতে হবে, তাও বোধগম্য হল না। প্রথম অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গের সীমারেখা আর ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা পেরিয়ে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই পেয়ে যাই চারজন গবেষকের লেখার বর্ণনা এবং সিদ্ধান্ত "চারজন গবেষকেরই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত —সামগ্রিক নয়। একথা তাঁদের বইয়ের শিরোনামই প্রমাণ করবে" [পৃ ১১]। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ব্রাহ্ম আন্দোলন, সহবাস-সম্মতি আইন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—এর বর্ণনা আমরা পাই এইভাবে : "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে বিভিন্ন সব মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সব মতামতকে এখানে কয়েক ভাগে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত" [পৃ ১৪৯] বর্ণনা তিনি দিয়ে গেছেন। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম কবে তৈরি হয়েছিল বা তার সদস্যসংখ্যা কত ছিল ; বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কে কোন্ পক্ষে ছিলেন বা সহবাস-সম্মতি আইনে হিন্দুরা কতটা সরব—এই সবই বলা হয়েছে। কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ে কিছু সংবাদপত্র-এর প্রকাশকাল এবং সভা-সমিতির গড়ন-গঠন-এর বিবরণ দেওয়া আছে।

কেন এই চারটি বিষয় লেখকের বিবেচনায় আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেল তার ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন। আবার নিজেই লিখছেন (১) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আঁচ পূর্ববঙ্গে এসে পৌঁছলেও তা ছিল সামান্য [পৃ ২১৪]। (২) ১৮৬০-এর আগে ঢাকায় আর মফস্সলে স্থাপিত সমাজগুলোর শক্তিশালী কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না [পৃ ১৭২]। এটা ঠিক যে, ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ ভাঙনের পর আর তেমন কোনো অগ্রগতি হয় নি, সভ্যসংখ্যাও কমেছে ক্রমান্বয়ে [পৃ ১৬২] এবং ১৮৮২-৮৩ সালের পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের এক তালিকা অনুযায়ী দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের মোট ব্রাহ্ম-সংখ্যা ৮১ জন, বহিরাগত ১১ জন, মোট ৯৩ জন [পৃ ১৭৫] (৩) আর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের সংখ্যাও ছিল বেশি [পৃ ২০২]। এই বিবরণ বা লেখকের 'বিশ্লেষণ' শেষ হয়ে যায় ১৩ পৃষ্ঠায়, এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের বর্ণনা চলে ৩১ পৃষ্ঠা নিয়ে।

তাই লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি কোথায় শুরু হয়ে কিভাবে শেষ হয় তা পাঠকের পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে। কারণ, লেখক নীলবিদ্রোহ, পাবনার কৃষকবিদ্রোহ, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করলেন না অন্য দু-জন লেখক আলোচনা করেছেন এই যুক্তিতে। তাঁর নির্বাচিত বিষয়গুলিও অনেক লেখকই আলোচনা করেছেন। এই বিদ্রোহের একটি নিয়ে যদি আলোচনা করেন "তাহলে দেখবো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলে, ঐক্যবদ্ধভাবে তারা (সাধারণ মানুষ) শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল" [পৃ ২১৫-২১৬]। তাই হয়তো তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলন, সহবাস-সম্মতি আইন নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন, কেন পূর্ববর্তী গবেষকদের 'বিবরণ' বা 'আলোচনা' "খণ্ডিত, অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ইতিহাস মাত্র"— তাঁরটি কেন নয়।

সমাজনিরীক্ষার যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের কথা ছেড়ে দিয়েও তাই প্রশ্ন জাগে লেখকের মননশীলতা নিয়ে, বিষয়নির্বাচনের যুক্তিকাঠামো নিয়ে।

ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎপাদনপদ্ধতি ও শ্রেণীবিন্যাসের কাজটি লেখক সেরে ফেলেছেন। যদিও কৃষিভিত্তিক উৎপাদনসম্পর্কের সাথে জড়িত ভূমিবণ্টনের কোনো তথ্য আমরা গ্রন্থটিতে পাই না। বিশেষ অধ্যায়টিতে ১৩টি সারণী রয়েছে। কিন্তু সমস্যাটির মূল চারটি চারিত্রিক লক্ষণ : ১) জমি আর উৎপাদনের উপর মালিকানাস্বত্ব কার কতটা, ২) জোতের আয়তন, ৩) ব্যক্তি-মালিকানা, জমির আর জোতের বিষম বণ্টন, ৪) ভূমিরিক্ত চাষীদের জমি আর উৎপাদনের উপর মালিকানা-স্বত্ব না থাকা নিয়ে কোনো সঠিক আলোচনা না থাকায় শ্রেণীবিন্যাসের স্তরটিও পরিষ্কার হয়ে ওঠে না।

তাই এই গ্রন্থটি পূর্ববঙ্গের সমাজবিন্যাসের স্পষ্ট কোনো চেহারা পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারে না। কিন্তু বেশি বা কম তথ্যের সংকলন করলেই, ঘটনাবিশেষের প্রেক্ষিতে কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করলেই কোনো গ্রন্থ গবেষণাগ্রন্থ হয়ে ওঠে না।

কমলেন্দু ধর

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অমিতাভ বুদ্ধদেব

গৌতম নিয়োগী

'আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্ত নিভৃতে যা তাঁকে বারবার সমর্পণ করেছি, সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

'একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করিনি?'

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে চুয়াত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই শুরু করেছিলেন তাঁর ভাষণ। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধ-জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' রূপে সর্বযুগের ভারতের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব অমিতাভ বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। আর এই সশ্রদ্ধ প্রণতি যে কোনো একদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের 'উপকরণগত অলংকার নয়', বরং তিনি সারা জীবন 'বারবার সমর্পণ' করেছেন তাঁর ঋণ, সেই স্বীকারোক্তি সর্বাংশে সত্যি। প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে, ধর্মতত্ত্বালোচনায় বারবার এসেছে বুদ্ধ-প্রসঙ্গ। বিশ্বকবির ১২৫তম জন্ম-জয়ন্তী বৎসরে তাঁর উক্তি বিশ্লেষণ এবং সম্প্রসারণের তাগিদেই আমাদের বিনম্র নিবেদন বর্তমান প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ প্রথম পাই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রাবণ, ১২৯০) 'অনাবশ্যক' নামক প্রবন্ধে, যার এক জায়গায় তিনি লিখছেন (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাতাশ):

'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপরে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই। যখন দেখি ছুটন্ত ফুটন্ত বর্তমান স্রোতের উপরে পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে।'

সেই 'বুদ্ধের ভক্ত' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের একেবারে শেষ সীমায় আশি বছর বয়সে আছেন হিমালয়ের কোলে শৈলশিখর দার্জিলিঙ জেলার মংপুতে। সেখানে ১৯৪০ সনের ৬ই মে, সোমবার, লিখলেন একটি কবিতা:

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে

বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
…শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশিবর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

দেখা যাচ্ছে সাতাশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে যে বুদ্ধভক্তি, তা মৃত্যুর এক বছর আগেও প্রবহমান। বাস্তবিকই তিনি তাঁকে 'অন্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব' বলে জানতেন। পিতৃদেব সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে পূর্বসূরী ইতিহাসের চরিত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ছিল যুগপ্রবর্তক রামমোহন রায়ের প্রতি, যাঁকে তিনি 'জীবনের হীরো' বলে মনে করতেন এবং আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারত-পথিক'। তেমনি প্রাচীন ভারতবর্ষ তো বটেই, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের চরিত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রভাবনায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুটি শব্দ খুব প্রিয় ছিল: 'অমিতাভ' এবং 'অমিতায়ু'। তিনি পৌষ, ১৩১৮ সংখ্যা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় লিখেছিলেন:

'এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।'

আবার দীর্ঘকাল পরে ২৪ অকটোবর ১৯৩১ তারিখে 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতায়:

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।

বুদ্ধদেব তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন মুক্তিকামী মানুষ হিসেবে। এই মুক্তি অবশ্যই সংসার তথা পার্থিব সমস্যার জটিলতা থেকে পরিত্যাগ করার পলায়ন-মনোবৃত্তি নয়, যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন তাকে শরণ নিতে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে চেয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধ তাঁর কাছে শুধু ত্যাগী নয়, মৈত্রীসাধনের মুক্তিসাধক। তাই পশ্চিমী বণিকসভ্যতার এবং ধনলোভী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি কটাক্ষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানালেন করুণাঘন তথাগতকে, যিনি শোনাবেন শান্তির ললিতবাণী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

'আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম, নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপে প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

॥ ২ ॥

হরপ্পা-মহেঞ্জদারোর সময়, কিংবা তার পরবর্তী বৈদিক আর্যদের ভারতের ভূমিতে প্রবেশ এবং বৈদিক যুগের সূচনা থেকে অদ্যাবধি ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, এই উপমহাদেশের যেসব মনীষী ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌতম বুদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিজনোচিত উচ্ছ্বাসে যে বলেছিলেন—'উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার। আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর।'—তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আছে।

আড়াই হাজার বছর আগে যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ধর্মের আলোয় সারা ভারত আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং দেশকে আলোকিত করে রেখেছিল প্রায় বারো শো বছর, আমাদের জাতীয় জীবনে সেই প্রভা নানা ঐতিহাসিক কারণে অস্তমিত হয়ে গেল। তার বিস্তারিত পরিচয় এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ আমাদের এই আলোচনার পরিধির বাইরে। যে উদার মানবতাবাদ সম্রাট অশোক (খ্রীপূ ২৭২-২৩২) ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চীন, জাপান, সিংহল, সিয়াম, কম্বোজ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেই মানবধর্ম প্রচণ্ড রাষ্ট্রশক্তি, লোকাচার এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল বহু বৎসর আমাদের এই ভারতবর্ষে। প্রায়-বিস্মৃত বুদ্ধদেবকে জাতীয় জীবনে নূতন মহিমায় মণ্ডিত করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে। তথাগতের মৈত্রী, করুণা এবং সেবার আদর্শকে ভারতীয়রা আবার বরণ করতে শুরু করেন, যার পূর্ণ পরিণতি স্বাধীন ভারত কর্তৃক অশোকস্তম্ভের এবং বৌদ্ধ ধর্মচক্রের জাতীয় স্বীকৃতি। উনবিংশ শতাব্দী থেকে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে জাতীয় জাগরণ শুরু হল, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন ভারতের প্রতি অনুরাগ। শুরু হল আধুনিকভাবে ইতিহাসচর্চা, ভারততত্ত্ব ও পুরাবৃত্তচর্চা। এই চর্চার উজ্জ্বল ধারায় ক্রমে লক্ষ করি বাঙালি মনস্বী বুধমণ্ডলীর বুদ্ধদেবের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এই সঙ্গে জাগরণের স্রোতে যুক্ত হল আরো একটি ধারা। নানা ধর্মের সারসত্য নিয়ে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে, গোষ্ঠী-জাতি-উপদলীয় ভেদাভেদ দূর করে লোকহিত প্রতিষ্ঠা করা। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং তৎপ্রবর্তিত ব্রাহ্ম-আন্দোলন এ-বিষয়ে অনন্য পথপ্রদর্শক। একদিকে নতুনভাবে ইতিহাসচর্চার জোয়ার এবং অন্যদিকে ভাবজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মনের ব্যাপ্তি, একদিকে নানা উদার চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ এবং অন্যদিকে ভারতের শাশ্বত মিলনবাণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, একদিকে ব্রাহ্মসমাজের উদার সংস্কারমুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে আচারসর্বস্বতা তথা অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি, অন্যদিকে স্বাজাত্যবোধ এবং জাতীয় চেতনা থেকে ক্রমে সার্বজনীন মূল্যবোধে উত্তরণ—এই পটভূমির মধ্যেই লালিত হয়েছিল রবীন্দ্রমানস। তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল

বুদ্ধদেবের চারিত্রিক মহত্ত্ব উপলব্ধি করা।

তাই রবীন্দ্রভাবনায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে রামমোহনের সময় থেকে ভাবপরিবেশ এবং পট-ভূমিকা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশে তুলনামূলক ধর্মচর্চার জনক রাজা রামমোহন রায়। তিনি যে কেবল বাঙলা, ইংরিজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি, হিব্রু, ল্যাটিন প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তাই নয়, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্মে এবং দর্শনে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং অধিকার ছিল। গভীর চিরাচরিত প্রথা, আচার এবং বর্ণাশ্রমের অভিশাপে জর্জরিত বিভ্রান্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম যে একদিন প্রেমে, প্রজ্ঞায় ও ত্যাগের আদর্শে সব মানুষকে এক করার ব্রত নিয়েছিল, রামমোহন তা জানতেন এবং ফলে বৌদ্ধধর্মের এই কালজয়ী আদর্শকে পুনরুজ্জীবনের সার্থক প্রয়াস দেখা যায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে। তাই এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মনীষী কৃষ্ণ-বিহারী সেন (১৮৪৭-১৮৯৫) লিখেছিলেন : "Brahmoism is a protest against idolatry and superstition, and a rise and progress of rationalism in the East. It started with the spirit of Buddhism, whose higher developments it assimilated to it."

অন্যান্য দেশী-বিদেশী ধর্মশাস্ত্রের মতো বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চাও রামমোহন করেছিলেন কিন্তু বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী হিসেবে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বভাবকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি ; তার রচনায় সে প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি এই ধর্মের উদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ছিলেন আগ্রহী এবং শ্রদ্ধান্বিত। তার প্রমাণ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বজ্রসূচী' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ-সহ প্রকাশ। 'বজ্রসূচী' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদপ্রথার যে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা আছে তা নিশ্চয়ই রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল।

পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মসমাজে ব্যাপক বুদ্ধচর্চা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক কিছু লেখেন নি বটে, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রী পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও পুত্র-প্রতিম কেশবচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সিংহল-ভ্রমণে এবং সেই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য এবং পরস্পর আলোচনার ফলে তাঁদের মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯-৫৯) বাঙলায় পুরাবৃত্ত এবং ইতিহাস চর্চায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) তাঁর "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের (১৮৮৩) অন্তর্গত 'বুদ্ধা-বতার' অংশে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৮৬৬ খ্রী ব্রাহ্মসমাজে ভাঙনের পর মহর্ষির নেতৃত্বাধীন আদি-ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় রচনার প্রকাশ অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে নব্য দলের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪) পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও বুদ্ধদেবের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধা-শীল। তুলনামূলক ধর্মচর্চায় কেশবচন্দ্রের আগ্রহের প্রমাণ 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থটি (১৮৬৬)। ১৮৭৮ খ্রী ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বার ভাঙনের পর একদিকে সাধারণব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (যা, ১৮৮০র পর থেকে "নববিধান" নামে পরিচিত হয়)—উভয়েই বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং বুদ্ধচর্চা অব্যাহত রাখেন। ১৮৮০ খ্রী কেশবচন্দ্রপ্রবর্তিত "সাধুসমাগম" অনুষ্ঠানের অন্যতম ছিল "শাক্য-সমাগম"। সর্বধর্মসমন্বয়মার্গ দিয়ে বিশ্বমানবের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দের মধ্যে কয়েকজনকে নানা ধর্মের অনুশীলনে নিযুক্ত করেন। যেমন অঘোরনাথ গুপ্ত বৌদ্ধধর্ম, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টধর্ম, গিরিশচন্দ্র সেন ইসলামধর্ম, গৌর-গোবিন্দ রায় হিন্দুধর্ম, চিরঞ্জীব শর্মা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্ম। পূতচরিত্র সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের (১৮৪১-৮১) নাম বাঙলাদেশে বুদ্ধচর্চার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর "শাক্যমুনিরচিত ও নির্বাণতত্ত্ব" (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) উচ্চাঙ্গের রচনা।

এর পর ব্রাহ্মসমাজের তিন ধারার মধ্যেই অব্যাহত থাকে বুদ্ধচর্চা, তার বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। শুধু কয়েকজনের উল্লেখ না করলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হবে। আদিব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) রচনা করেছিলেন "আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত" (১৮৯৯) এবং মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ভারতের প্রথম আই. সি. এস, রচনা করে-ছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত "বৌদ্ধধর্ম" (১৯০১)। এগুলি কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল। নব-বিধানমণ্ডলীর মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী সেন কর্তৃক বাঙলা ও ইংরিজিতে লিখিত বৌদ্ধধর্মবিষয়ক রচনাবলী সেযুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁর "বুদ্ধদেবচরিত", "অশোকচরিত" প্রভৃতির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ কৃষ্ণবিহারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎ, দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রতি-ষ্ঠিত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে পরিচালিত "সারস্বত সমাজ"-এর তাঁরা দুজন ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক এবং যার সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। "সাধনা" পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে কৃষ্ণবিহারীর বুদ্ধচরিত। অশোকচরিতের সপ্রশংস সমা-লোচনা হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। তা ছাড়া নববিধানগোষ্ঠী-ভুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুনীতি দেবী, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, ব্রজগোপাল নিয়োগী, দ্বিজদাস দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ মনীষীর বুদ্ধচর্চা উল্লেখযোগ্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অম্বিকাচরণ সেন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালিদাস নাগ প্রমুখ পণ্ডিতগণ কলম ধরেছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে। "সঞ্জীবনী" পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র কিংবা সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সুপণ্ডিত, প্রাচ্য তথা প্রতীচ্য দর্শনে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন নিরহঙ্কার বিস্মৃতপ্রায় শিক্ষক মহেশচন্দ্র ঘোষের দান বিশেষ স্মরণীয়। এঁদের লেখার সঙ্গেও পরিচয় ছিল রবীন্দ্রনাথের। ব্রাহ্মসমাজের বুদ্ধচর্চার ধারায় সঞ্জীবিত হন রবীন্দ্রনাথ।

অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের গোষ্ঠীর বাইরে বৃহত্তর সমাজে যে বুদ্ধচর্চা শুরু হয় তা যে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে নি, এমন নয়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রাতঃস্মরণীয় পুরাতত্ত্ব-বিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম, যাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন রবীন্দ্রনাথ। 'জীবনস্মৃতি'তে তাই দেখি : "বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।" রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে "ললিতবিস্তর" গ্রন্থখানির সংস্কৃত সংস্করণ (১৮৭৭), ইংরাজি সংস্করণ (১৮৮৬), An Introduction to the Lalita Vistar (১৮৭৭), Buddha Gaya—the Hermitage of Sakyamuni (১৮৭৮) এবং The Sanskrit Buddhist Literature (১৮৮২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুবই স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছের মানুষের এইসব বই পড়েছিলেন। আর-একজন স্মরণীয় বাঙালি ঐতিহাসিক রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭) অকালমৃত হন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'বুদ্ধ-দেবজীবনী ও ধর্মনীতি' (১৮৯১)। তা ছাড়া ক্রমে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। যেমন, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বসু প্রমুখ। তৎকালীন বাঙালি মনন প্রতিফলিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত' নাটকে (১২৯২) এবং নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্যে (১৩০২)। তা ছাড়া ইংরেজ কবি এডুইন আরনল-ডের Light of Asia নামক পরিচিত কাব্য (১৮৭৯) তৎকালীন শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করে প্রভূত পরিমাণে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রী ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লেখেন তাঁর Asoka, the Buddhist Emperor of India এবং দু বছর পরই সুবিখ্যাত রিস ডেভিডস দম্পতি প্রকাশ করেন বহুল-পঠিত Buddhist India। বুদ্ধদেবের ত্যাগোজ্জ্বল পূতচরিত্র এবং জ্ঞানোজ্জ্বল মৈত্রীধর্মের প্রতি বাঙালি শিক্ষিত মানুষের সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য ততদিনে পরিষ্কার। এই প্রবণতার বহুল প্রকাশ দেখি বিংশ শতাব্দীতে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "বেলাশেষের গান" কাব্যগ্রন্থের "বুদ্ধশরণ" দীর্ঘ কবিতায় লিখলেন :

বঙ্গে এল বুদ্ধবিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
নগর পুণ্ড্রবর্ধনও নেই—স্বপ্ন হয়ে গেছে ;
নেই বালিকা উপাসিকা, আমরা তারই হয়ে
বরণ করি বুদ্ধবিভা চিত্তপ্রদীপ লয়ে,
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধবিভূতিরে,
নিরঞ্জনা তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে।

বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে বারে-বারে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ প্রণতি এই ঔৎসুক্যেরই প্রকাশ। উপনিষদের পরেই বুদ্ধদর্শনের প্রতি প্রাণের টান। আন্তরিকভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বিশ্বমৈত্রীবন্ধনের কাজে বুদ্ধদেবের আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধ সংস্কৃতির মহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা বাঙলা

সাহিত্যে তো বটেই, যে-কোনো আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বিরল। তাঁর চিন্তায় এবং ভাবাদর্শে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ সহজেই পাওয়া যায়।

বৈশাখী পূর্ণিমা এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমা, এই দুটি বুদ্ধ-জীবনের স্মরণীয় তিথি। প্রথমটি তাঁর মহাআবির্ভাব, বুদ্ধত্ব-লাভ ও মহাপরিনির্বাণের দিন ; দ্বিতীয়টিতে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন ধর্মচক্র-প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে এই দুটি তিথির গুরুত্ব মর্যাদাসহকারে পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁরই নির্দেশে প্রতি বছর আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন উৎসব পালিত হওয়ার সূত্রপাত। বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ২১ ফাল্গুন ১৩৩৩ তিনি লিখেছিলেন 'বুদ্ধজন্মোৎসব' শীর্ষক সুপরিচিত কবিতাটি, যার প্রথম স্তবক এরকম :

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
করো ত্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী।
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণী শীতল করো কলঙ্কশূন্য।

এর পরে 'নটীর পূজা' নাটকে (পৌষ, ১৩৩৮) এই কবিতাটি গান হিসেবে অন্তর্গত হয়। বস্তুতপক্ষে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পেছনে নানাবিধ প্রেরণার মধ্যে বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শের স্মৃতি অন্যতম। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে (৮ পৌষ, ১৩২৮) বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভি-ভাষণে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সে-কথা স্মরণ করে বলেন :

"পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ-যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।" তারপর আমাদের দেশে বুদ্ধচর্চার অন্যতম পীঠ-স্থানরূপে গড়ে ওঠে বিশ্বভারতী। বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার সূত্রপাত অবশ্য বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিপুত্র, জানিয়েছেন যে আশ্রম-বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। তাঁকে ধম্মপদ গ্রন্থখানি আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করতে হয়েছিল। পরে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করে দেন এবং উত্তরকালে বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ তা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ধম্মপদের অনুবাদের কাজে হাত দিয়ে-ছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত তা অসমাপ্ত থেকে যায়। উত্তরকালে শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের "বিশ্বভারতী পত্রিকা"তে ওই অসমাপ্ত অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর দেশ-বিদেশের বহু বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিশ্ব-ভারতীতে সারস্বতচর্চায় রত ছিলেন। উল্লেখ করতে পারি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ধর্মাধার মহাস্থবির, সিলভ্যাঁ লেভি, লিন ও চিয়াং, যোসেফ তুচ্চি, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, তান য়ুন শান এবং প্রবোধ-চন্দ্র সেনের নাম। সকলের উপরেই রবীন্দ্রপ্রভাব প্রভূত-পরিমাণ।

বৌদ্ধ আখ্যানমূলক বহু কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্র-নাথ। সেগুলি বহুল-পঠিত। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, পূজারিণী, অভিসার, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী ইত্যাদি নিয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সরাসরি বুদ্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নাথ অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন। সে-বিষয়ে একটু বলা দরকার। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২১ ফাল্গুন রচিত "বুদ্ধজন্মোৎসব" কবিতাটির কথা আগেই বলেছি। ১৯২৭ খ্রী দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সফরে গিয়ে কবি লিখেছিলেন দুটি অনবদ্য কবিতা। ২৩ সেপটেম্বর ১৯২৭ (১৩৩৪)-এ 'বোরোবুদুর' এবং ১১ অকটোবর ১৯২৭ (১৩৩৪)-এ 'সিয়াম : প্রথম দর্শনে'। দুটি কবিতাই পরে পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বোরোবুদুর' কবিতায় কবি লিখলেন :

…তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অজেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

তা ছাড়া ২৪ অকটোবর ১৯৩১ (১৩৩৮) দার্জিলিঙে বসে কবি সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচনা করেন 'বুদ্ধদেবের প্রতি'। এই কবিতাটিও "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন :

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।

একই বছরে 'নটীর পূজা'য় অন্তর্গত করবার জন্য লেখেন 'সকলকলুষতামসহর'। ২৯ জুলাই ১৯৩৩ কবি রচনা করলেন 'প্রার্থনা' কবিতাটি। প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৪০ সংখ্যা "বিচিত্রা" পত্রিকায়। ওই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস' তাদের জন্য বুদ্ধের করুণা প্রার্থনা করেন।

বৌদ্ধ-আখ্যানমূলক যেসব নাটক লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে প্রধানভাবে মনে পড়ে মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা। 'মালিনী' নাটকের উপজীব্য বৌদ্ধ বিশ্বজনী-নতার সঙ্গে সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ। জয়ী হয়েছে ক্ষমার আদর্শ। "চণ্ডালিকা" নাটকে চণ্ডালকন্যার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথের মন যেন জেগে উঠেছে— 'ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।' চণ্ডালিকার প্রধান উপজীব্য এই যে মহতের কাছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ যেমন নেই, তেমনি সবার উপরে মানুষ সত্য। 'নটীর পূজা'তে জাতিভেদবিরোধী রবীন্দ্রনাথ, পতিত-অবজ্ঞাত সমাজের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধদেবের উদার স্পর্শে যেমন নীচের তলার মানুষ আভিজাত্য পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে মুগ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেবকে জানার পক্ষে অবশ্য সবচাইতে বেশি প্রয়োজনীয় তাঁর গদ্যরচনাগুলি। "সমা-লোচনা" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "অনাবশ্যক" প্রবন্ধটির কথা গোড়াতেই বলেছি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত।' ১৯০৪ খ্রী চারুচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় "ধম্মপদ" প্রকাশিত হলে এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "এই ইতিহাসের (ভারতীয় সংস্কৃতির) বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায়, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।" সমালোচনাটি ধম্মপদং নামে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। আসলে বুদ্ধচর্চা যিনিই করতেন তাঁকেই অভিনন্দন জানাতেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের দেশের জাতিভেদপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতা রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়া দিত। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মূল বাণীই হল —'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে / এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' গীতাঞ্জলির বহু গানেই এই ধ্বনি। বারবার তিনি জাতির উদ্দেশে বলেছেন— 'পশ্চাতে রাখিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' আহ্বান করেছেন—'এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন / ধরো হাত সবাকার / এসো হে পতিত, হোক অপনীত / সব অপমানভার।' বুদ্ধদেবের ধর্মের মূল বাণীও সর্বমানবের সমতা, যেখানে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, শূদ্রের ক্ষুদ্রতা নেই। তাই বৌদ্ধ বাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রাণের টান। ১৩১০ বঙ্গাব্দে রচিত "মন্দির" প্রবন্ধে (পরে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইয়ের অন্তর্গত) কবি লিখেছিলেন :

'ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লোভ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।'

পরের বছরই "উৎসবের দিন" প্রবন্ধে (এটি তাঁর ধর্ম পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়) রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের করুণা প্রসঙ্গে বললেন একই কথা :

'ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য-বশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।'

বৌদ্ধধর্ম সামাজিক ধর্ম। জগতের পার্থিব সমস্যাকে এড়িয়ে গৃহত্যাগী মায়াবাদী সন্ন্যাসধর্ম এটি নয়। তাই বুদ্ধদেব উপদেশ দেন জীবনে দুঃখস্বীকারের, লোভ, হিংসা বিলাস জয় করার। আত্মোপলব্ধিই দুঃখ-জরার থেকে নিষ্কৃতি। ৯ এবং ১৪ চৈত্র, ১৩১৫ তারিখে দুটি ভাষণে (শান্তিনিকেতন-১, "ভূমা" এবং "আদেশ") সেই কথা। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি

প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাব পায়।" অতঃপর "বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী ? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে।"

"মুক্তির পথ" শীর্ষক শান্তিনিকেতন ভাষণে (৭ বৈশাখ, ১৩১৬) রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের বিশ্বপ্রেমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : 'বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।' তাঁর ওই বছর ৭ই পৌষের উপদেশও এইরকম :

'বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্য এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয় ; কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না।'

বৌদ্ধবাদের যেসব দিক রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর সদাজাগ্রত মানসকে আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করেছিল, তা হল : মানবপ্রেম, জাতিভেদ-বিরোধিতা, আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা বিশ্ব-মৈত্রী, ত্যাগ, করুণা, অহিংসা ও প্রেম। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তত্ত্বমুখী জ্ঞান অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের প্রেমমুখী জ্ঞানকে তিনি আধুনিক যুগের উপযোগী মনে করতেন। বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই স্বাভাবিক। তাঁর ইতিহাসচিন্তায় ধরা পড়েছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র। ত্যাগ এবং প্রেমের এই মিলনকেই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলেছেন "বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ" প্রবন্ধে। এটি প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব-বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনে করি। হীনযান এবং মহাযান—উভয় সম্প্রদায়ের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনুধাবন করে, তিনি বলেন : 'বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যস্থান যেখানে।'

বুদ্ধদেবের অপর শিক্ষা অহংকার-বর্জন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে (৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'জগতে যে সমস্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ঐ প্রকৃতি—সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়,—এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চারদিকে ভিড় করে আসত না।' (দ্র প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৮)

বুদ্ধদেবের জীবন, চরিত্র, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রদ্ধার বিষয় তেমনি বুদ্ধদেবের বা বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিও রবীন্দ্রনাথের কাছে পবিত্র। তাই "বৃহত্তর ভারত" প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১৩৩৪ ; পরে 'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত) তিনি এগুলিকে বলেছেন 'তীর্থস্থান।' বুদ্ধগয়া তিনি যান একাধিকবার। ১৯০৪ খ্রী বুদ্ধগয়া দর্শন করে এসে লেখেন "উৎসবের দিন" প্রবন্ধ (বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়, মাঘ, ১৩১১)। আবার যান ১৯১৪ সালে। অন্তরের শ্রদ্ধা জানান বুদ্ধমূর্তির পাদদেশে। কৃষ্ণ কৃপালনি এই সম্বন্ধে লেখেন—"Only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya." দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিয়াম (বর্তমান থাইল্যানড) বা বোরোবুদুর (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) তিনি যান। রচনা করেন কবিতা। জীবে দয়া যে মানুষকে ভালোবাসার মতোই অবশ্য কর্তব্য, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর "জাভাযাত্রীর পত্র" বইয়ের ১৯-সংখ্যক পত্রে (১৩৩৪)। নানা স্থানে বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত স্মৃতিস্থান দেখে তিনি নিজেই প্রেরণা পান।

শুধু ধর্ম আর দর্শন নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও 'বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ' সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "ভারত-ইতিহাস-চর্চা" রচনাটিতে। যেসব সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারত মানেই হিন্দু-ভারত মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের মত তাদের থেকে আলাদা। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগে ভারতের অর্থনৈতিক প্রসারও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি লিখেছেন 'যাত্রার পূর্বপত্র' (১৩১৯, পরে 'পথের সঞ্চয়' বইতে অন্তর্গত) রচনায় : 'বৌদ্ধধর্ম বিষয়শক্তির ধর্ম নহে, এ-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এ-দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য শক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।'

জীবনের পরিণত বয়সে রচিত "মানুষের ধর্ম" (১৩৩৯) গ্রন্থের তৃতীয় পর্যায়ে অমিতাভ বুদ্ধদেবের প্রতি আবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রবীন্দ্রনাথ :

'মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন। বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।'

এরও পরে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৪ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে লিখেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'বুদ্ধদেব', যার উল্লেখ প্রবন্ধের গোড়াতেই করেছি। প্রবন্ধটি আষাঢ়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেদিন যে-প্রশ্ন করেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। কবির ১২৫তম জন্ম-বছরে সেকথা স্মরণ করি :

'ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল ? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ ? কেউ ছিল কি অনার্য ? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষের জন্য। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে ?'

এ-প্রশ্ন তো আমাদের সকলেরই।

বিশ্বসাহিত্য

বুদ্ধিজীবীর মৌষলপর্ব

Esmail Fassih—Sorraya in a Coma (Zed Books Ltd.) প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪ ; ইংরেজি অনুবাদ ১৯৮৫

আমাদের বিদেশী সাহিত্যপাঠের অভ্যেস এখনো একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে আছে, মূলত। বিদেশী সাহিত্য বলতে আমরা এখনো বুঝি প্রধানত ইউরোপীয় সাহিত্য। আমাদের চিন্তার ইউরোকেন্দ্রিকতা এখানেও প্রতিফলিত। সমকালীন বিশ্বজনীনতার কথা মাথায় রেখেও বলা চলে যে, ইউরোপীয় মনোজগৎকে আমাদের স্বদেশ বানানোর চেষ্টা অপচেষ্টা। অথচ ইউরোপের বাইরে পৃথিবীর স্থলভাগের যে-তিন-চতুর্থাংশ মতো ভূমিখণ্ড রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের সুখদুঃখের খবর এক অর্থে আমাদের কাছে অনেক জরুরি হতে পারত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা আমাদের খুব কাছাকাছি। এই সমীপবর্তী অভিজ্ঞতার পেছনে যেসব কার্যকারণসম্পর্ক রয়েছে তার নাটের গুরু ভুবনজোড়া উপনিবেশবাদ। যদিও সব দেশই যে সব সময়ে সরাসরি এর শিকার হয়েছে, তা নয়। তবে তাতে খুব কিছু যায় আসে না। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাবার পর থেকে সাম্রাজ্যের হাত যে কত দেশে কত ভাবে কতবার বিস্তৃত হল তার কাহিনী আজ আর অজানা নয়। ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে দেশীয় সমাজ- অর্থনীতি- সাহিত্য- সংস্কৃতিতে যেসব বিকৃতি দেখা দেয় তার বিচার-বিশ্লেষণও আজ অল্পবিস্তর সবার জানা। বিকৃতির পুরো কাহিনী এখনো সব নিশ্চয়ই আমাদের চোখে ধরা পড়ে নি। সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে এইসব নানাদিক ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। তবে এইসব বিকৃতির একটা ধাঁচ আমাদের আন্দাজে আছে।

"সৎসাহিত্য" কথাটা ক্লিশের পর্যায়ে চলে গেছে বলে ওটা বাদ দিয়ে শাদামাটা "ঠিক সাহিত্য" কথাটা ব্যবহার করছি। এই ঠিক সাহিত্য আর বেঠিক সাহিত্যের ফারাকটা যেমন স্পষ্ট তেমনি জরুরি। বিকৃতি-বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীর যে-ভূমিকার কথা বলছিলাম সেখানে এই ঠিক সাহিত্য বেজায় কাজে লাগতে পারে। সাহিত্যের উপাদান ইতিহাস জানবার, বোঝবার, রচনা করবার জন্য তো ব্যবহার করা হয়েই থাকে। অর্থাৎ শ্রদ্ধ সাহিত্য বলে যে-জিনিসের কল্পনা আমরা মাঝে-মাঝে করে থাকি, সাহিত্য কিন্তু তার সে-শ্রদ্ধতা আগেই হারিয়েছে। হয়তো কোনোদিনই ছিল না, থাক্‌বার কথাও নয়। কারণ, সাহিত্য যেহেতু শব্দে রচিত, আর শব্দের যেহেতু বাচ্যার্থ থাকে, তাই সাহিত্য কোনো কিছু নিয়ে কিছু একটা তো বলে। যথার্থ বলতে গেলে, এই কারণেই ঠিক সাহিত্য আর বেঠিক সাহিত্যের কথাটা উঠছে। কেননা, কথা বলতে গিয়ে সাহিত্য ঠিক কথাও বলতে পারে, বেঠিক কথাও বলতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি থেকে সাহিত্যকে দেখতে গেলে এই ঠিক-বেঠিকের কথাটা বাদ দিয়ে শুধু রসোত্তীর্ণ শিল্পের চিন্তায় মশগুল হলে চলবে না। এই কথাটা ভুল বোঝবার খুব আশঙ্কা রয়ে গেল জানি। রসোত্তীর্ণতার সঙ্গে কোনোরকম আড়াআড়ি করবার উদ্দেশ্যে যে এই বাক্য লেখা হয় নি, একথা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বেঠিক সাহিত্য সাধারণ পাঠককে বড়োজোর রমণীয় মিথ্যার ফাঁদে জড়াবে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীকে তো সে রীতিমতো বিপাকে ফেলে দেবে। তাই সমাজবিজ্ঞানীর সাহিত্যপাঠ খুব সাবধানী হওয়া চাই। ঠিক-বেঠিকের নিরিখগুলো টানটান থাকে যেন।

এসমাইল ফাসিহ্‌, আধুনিক ইরানের প্রতিষ্ঠিত লেখক। ১৯৩৫-এ তেহরানে তাঁর জন্ম। ১৯৫৬-তে উচ্চশিক্ষার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। বিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্যের ডিগ্রি অর্জন করেন সেখানে। দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি কাজ করেছেন ইরান জাতীয় তেল কোমপানিতে। আবাদান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে তাঁর কর্মোপলক্ষে সরাসরি আবাদানের যুদ্ধস্থলে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৮১-তে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে বাধ্য করা হয় অবসর গ্রহণ করতে। বর্তমান উপন্যাস ছাড়াও ফাসিহ্‌-র রচনার মধ্যে আরো তিনখানি উপন্যাস রয়েছে। দ্য র ওয়াইন (১৯৬৮), দ্য ব্লাইন্‌ড হার্ট (১৯৭২) দ্য স্টোরি অব জাভেদ (১৯৮০)। এ ছাড়াও অনেক ছোটোগল্পের তিনি রচয়িতা। বর্তমান উপন্যাসের প্রথম প্রকাশকাল ১৯৮৪।

সত্তরের শেষ দিক থেকে আশির দশকের ইরানের কথা একটু ভাবা যাক। পশ্চিম এশিয়ার তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশ বিশ্বব্যাঙ্কের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মধ্য-আয়ের তেল-রপ্তানিকারী দেশগুলির অন্যতম। শিক্ষা-সংস্কৃতি-জীবনযাপনপ্রণালীতে এদেশের গায়ে পশ্চিমা হাওয়া লেগেছে বেশ অনেকদিন হল। প্রজাতান্ত্রিক ইরান শুধু প্রশাসনিক অর্থে পহ্লবী বংশের অবসান সূচিত করে না, আধুনিকতার অর্থেও তাই। ব্যাপারটা অবশ্যই এরকম সরলরেখায় ঘটে নি। মধ্যযুগের সাফাবিদ বংশের শাসনকালেও (১৫০২-১৭৩৬) নানা ধরনের আভ্যন্তরীণ সংঘাত ছিল। ১৭৭৯-তে কাজারদের শাসন প্রচলিত হয় এবং এই সময়ে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রভাবে একটু-একটু করে ইরানের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে থাকে। বিশ শতকের শুরুতে ইংরেজ-রুশ বিবাদের ঢেউ এসে লাগে ইরানি জীবনে। ১৯০৬-এ শাহ নাসের উদ্‌-দীনের সংবিধান চালু হয় ও তাঁর আমলেই ইরানের পারলামেনট "মজলিশ" প্রবর্তিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২১-এ দুর্ভিক্ষ ও জাতীয় দেউলেপনার মধ্য দিয়ে রেজা খান ক্ষমতায় আসেন। ১৯২৫-এ শেষ কাজার শাসককে বিতাড়িত করে রেজা শাহ পহ্লবী নামে তিনি নিজেকে শাহ-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪১-এ নাৎসিদের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। এর পরে ক্ষমতাসীন হন তাঁর পুত্র মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লবী। এই পর্বেই ইরান প্রকট পশ্চিমায়নের মধ্য দিয়ে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত ছিল আগামী সংকটের বীজ। ধর্মীয় নেতারা এই পশ্চিমায়ন-পর্বে ক্রমেই বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পহ্লবী শাহ-এর রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকে। সত্তরের দশক জুড়ে শাহ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমে জোরালো হয়ে ওঠে, এবং ১৯৭৯-তে শাহ সরকারের পতন হয়। এই সময়ে পারী প্রবাস থেকে দেশে ফেরেন শিয়াপন্থী আয়াতুল্লা রুহোল্লা খোমেইনি এবং তাঁর তদানীন্তন বিশ্বস্ত সঙ্গী ইসলামি অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বানী-সদর। খোমেইনির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র। তাঁরই মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বানী-সদর রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত হলেন ১৯৭৯-র ৪ ফেবরুয়ারি তারিখে। ১৯৭৯-র নভেমবরে ৬৬ জন মারকিন নাগরিককে তেহরানে বন্দী হিসেবে অবরুদ্ধ করা হয়। পুরো বছর-খানেক জুড়ে চলল এই বন্দী-সমস্যা। ১৪ জন বন্দীকে গোড়ার দিকেই 'ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, বাকি ৫২ জনকে আটকে রাখা হয় প্রায় এক বছর এবং তাই নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে সেই বন্দী-সংকট। ১৯৮০তে ইরাকি আক্রমণের পরে একদিকে যেমন অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি অন্যদিকে দেশপ্রেমের জোয়ার তুঙ্গে ওঠে। খোমেইনির পক্ষে এই দেশপ্রেম তখন প্রায় আল্লাপ্রেরিত আশীর্বাদের মতো কাজ করেছিল। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের এই হল সংক্ষিপ্ত জন্মকথা।

ইরানের ক্ষেত্রে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখার মতো। কী বুঝি আমরা এই আধুনিকতা বলতে ? অনেক ক্ষেত্রে অন্তত আধুনিকতা বলতে যা বোঝায় তা হল মূলত পশ্চিমায়ন। বেশভূষা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি মনন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও রাজনীতি-অর্থনীতির সর্বস্তরে প্রতীচী প্রবণতার নাম আধুনিকতা। অথচ ওই শব্দের মধ্যে সদর্থক মানেও থাকতে পারত। একটা নিজস্ব ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে বাছবিচার করে বদলানো তো জীবনেরই ধর্ম। কোনো সমাজই কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে নি। এমন-কি তথাকথিত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বা এশীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা কিছুই ওই অর্থে স্থাণু নয়। পরিবর্তনের ধাঁচধোঁচ বা ধরনধারনে রকমফের আছে নিশ্চয়ই। সেসব ধরার জন্য ইতিহাসবেত্তারা বা সমাজবিজ্ঞানীরা ধারাবাহিকতা বা অবচ্ছিন্নতার ধারণা জুতসইভাবে ব্যবহার করেন। সদর্থক আধুনিকতা আসে এই ধারাবাহিকতার পারম্পর্যে আর আধুনিকতার নামে পশ্চিমায়নের মধ্যে রয়েছে ওই অবচ্ছিন্নতার নিশ্চিত ছাপ। তাই আধুনিকতা বললেই কিছু বলা হয় না, তার কুললক্ষণ শনাক্ত করতে হয়।

কুললক্ষণ নিয়ে কেন এই গরজ আমাদের ? কারণ, দুই ধরনের আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া সমাজদেহে ভিন্ন রকম। অবচ্ছিন্ন আধুনিকতার ক্ষেত্রে সমাজদেহে টেনশন তৈরি হয় অনেক বেশি। সেই টেনশনের চাপে হুড়মুড় করে দ্রুত ভেঙে যায় সব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দিগন্ত মুখর হয় 'গ্রামপতনের শব্দে'। খোলামকুচির মতো সব গুঁড়োতে থাকে রথের চাকায়। ধাবমান এই কোলাহলের মধ্যে দেখা দেয় প্রতিক্রিয়া। তা অনেক সময়ে উৎকট রূপ ধারণ করে। হাল আমলের

ইরানের ক্ষেত্রে যা ঘটে গেল তাও বোধ হয় এই। ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের জন্ম এই প্রতিক্রিয়ায়। প্রতিক্রিয়াটা ছিল চিন্তাহীন পশ্চিমায়নের বিরুদ্ধে, আর সেই অর্থে, আধুনিকতারও বিরুদ্ধে। এবং নিশ্চয়ই পহ্লবী একনায়কতন্ত্রের সামাজিক শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধেও। অন্তত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের মুখে যে সমাজতন্ত্রের বুলি ছিল, একথা ঠিক। ইতিহাস সরলরেখায় চলে না। এমনি করে তাতে জট পাকায়। প্রতিক্রিয়ার এই জমিটা খুব পিছল। পশ্চিমায়নের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে যাই আধুনিকতারই প্রতীপ পারে। তাই পশ্চিমি আধুনিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময়ে হিসাবগুলো ঠিকঠাক রাখা চাই, নইলে স্রেফ উলটো মুখে পাড়ি জমাবার আশঙ্কা থেকে যায়। ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস এই উলটো পাড়ির ইতিহাস। অথচ প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের প্রয়োজন ছিল। প্রতিক্রিয়ার পথেই তা সাধিত হবে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন।

ওই যে হিসেবগুলো ঠিকঠাক করে নেবার কথা বললাম, সে-কাজটা জরুরি। আর বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ঠিক এখানে। তাঁর কাজ ওই হিসেবপত্তর মেলানো। এই কাজ প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক আরামকেদারায় বসে করবার মতো নয়। ঝক্কিঝামেলা আছে, ফাঁড়া থাকে নানারকম। সঙ্গিহীন রুদ্ধঘরে দিন কাটাতে-কাটাতে একদিন অজান্তে সরে যেতে হয় নিজের ভিটেমাটি থেকে। চোখের থেকে মুছে যায় সি আই টি রোডের ভিখিরি মেয়ের এনামেল বাটি। হাত থেকে খসে পড়ে সৃষ্টিশীলতার সব জীবনকাঠি। ভরাডুবি হয় দেশের দশের আর নিজেরও।

এসমাইল ফাসিহ্-র "কোমায় আচ্ছন্ন সরাইয়া" এমনি এক ভরাডুবির কাহিনী। আধুনিক ইরানের বাছাবাছা একদল বুদ্ধিজীবী আজ পারীপ্রবাসী। তাঁদের মধ্যে আছেন লেখক শিল্পী অধ্যাপক কবি অনুবাদক এইরকম নানা ধরনের মানুষ। ইরানের বিপ্লবে এঁরা হয়তো একদিন সহযাত্রী ছিলেন। সেই সহমর্মিতা আজ বোধ হয় লুপ্ত। সেই প্রাচীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্মৃতি আজও হয়তো কাউকে কখনো উদ্দীপিত করে। তবে মুহূর্তেই সব ঢেকে যায় শীতল অন্ধকারে। আজ এঁদের জগৎ আটকা পড়ে গেছে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে কলহে চাপা যৌন আর্তিতে আর অবিরল মদ্যপানে। তেহরানে এঁরা মিলিত হতেন কাফে রিভিয়েরায় আর আজ পারীতে এঁদের মিলনকেন্দ্র কাফে দ্য লা সাঙ্কশিয়ঁ। কাফে রিভিয়েরায় এঁদের আলাপচারিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে না, তবে অনুমান করতে পারি সেখানে এঁরা ছিলেন ঘটনাবলীর একেবারে অভ্যন্তরে। পারীতে এঁরা যেন খসে-পড়া, খানিকটা বাতিল-হয়ে-যাওয়া, কিছুটা ফালতু। গেলাসের পর গেলাস সোমরসের মাত্রা যেমন চড়ে, এঁদের বিতর্ক বিভ্রম আর বাচালতাও তেমনি এগিয়ে চলে বল্গাহীন ভাবে। উপন্যাসের মুখ্য পাত্রপাত্রীরা সকলেই এই অর্থে কেন্দ্রচ্যুত, ছন্নছাড়া, কারুরই যেন মাথার ঠিক নেই। স্বদেশ বিষয়ে আজ আর এঁদের আগ্রহ নেই, তাও নয়। আছে, তবে সে খুব দূর থেকে দেখা। লিপ্ত নন আজ আর কেউ। এঁদের আজ প্রকৃত প্রবাস।

এই বিত্তবান উদ্বাস্তুদের দলে এসে পড়েছে জালাল আরিয়ান। কর্মব্যপদেশে। তার ভাগ্নী সরাইয়া কোমায় আচ্ছন্ন। হাসপাতালে শুয়ে। গভীর থেকে গভীরতর কোমার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে সরাইয়া। সরাইয়া পারীতে এসেছিল বিদ্যার্থিনী হিসেবে। ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। তার এখানকার পড়াশুনো শেষ। হঠাৎ যুদ্ধ লাগার দরুন আটকে পড়েছে। দেশে ফিরতে দেরি হচ্ছে। এর মধ্যে এই বিপদ। আচমকা এক রাস্তার দুর্ঘটনা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। সাইকেল থেকে পড়ে চোট লাগে মাথায়। তাই আজ সে কোমাগ্রস্ত। প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, এই অর্থে গোটা উপন্যাস জুড়ে সে জীবিত। কিন্তু সে কোথাও নেই, সংজ্ঞাহীন তার হাসপাতালের বিছানায় ছাড়া। দুনিয়ার কোনো সত্যিকার খবর তার মস্তিষ্কে আজ আর পৌঁছতে পায় না। স্পন্দনহীন স্নায়ু, অসাড় প্রত্যঙ্গ, জীবন্মৃত সরাইয়ার চিকিৎসার দেখাশোনার জন্য জালালের পারীতে আসা। সরাইয়ার উদ্বিগ্ন মা, জালালের বোন, ফারাঙ্গী তেহরানে। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, খরচের টাকা জোগাড় করা আর নিয়মিত টেলিফোনে ফারাঙ্গীকে সম্ভব হলে আশার বাণী শোনানো, এই হল পারীতে তার মূল দায়িত্ব। উপন্যাসের একমাত্র সুস্থ লোক এই জালাল। তার দায়িত্ব পালনের ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে শেষ পর্যন্ত।

কোমাগ্রস্ত সরাইয়া এই উপন্যাসে এক অমোঘ প্রতীকের মতো কাজ করে। কোমাগ্রস্ত এই ইরানি বুদ্ধিজীবী সজ্ঘ। বাইরের কোনো স্পন্দন আজ আর তাদের ছুঁতে পারছে না। শিকড়সুদ্ধ কাটা গেছে একেবারে। উৎপাটিতমূল এই বুদ্ধিজীবীদের আজ আর আঁকড়ে ধরার কিছু নেই। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, জাতীয় জীবন আজ নির্দ্বন্দ্ব, সেখানে কবিশিল্পীর উপজীব্য আর কিছু নেই। বরঞ্চ ঠিক উলটো। ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলছে। বোমাধ্বস্ত আবাদান, ইরানিদের হাতে মারকিন বন্দীদের লাঞ্ছনা, এইসব সাম্প্রতিক ঘটনা দিয়ে চেনানো সময় টুকরো-টুকরো করে ধরা রয়েছে এই উপন্যাসে ফ্ল্যাশব্যাকের কায়দায়। পারীতে জালালের ক্লান্ত তেতো দিনরাত্রির মধ্যে-মধ্যে, বিশেষত রাতের হাত-পা-এলানো বিশ্রামের সময়ে, আবাদান এসে হানা দেয় তার মাথায়। কেড়ে নেয় রাতের ঘুম। পারীপ্রবাসী এই বুদ্ধিজীবী-চক্রের ঘূর্ণির মধ্যে তাকেও টেনে আনা হয়েছে।

১৯৮০-র শেষ শরতের এক ঠাণ্ডা মঙ্গলবারের দুপুর দুটো নাগাদ তেহরান থেকে সে বেরিয়েছিল বাসে চড়ে। তেহরান ছেড়ে তখন সবার বেরিয়ে পড়ার হিড়িক। অনেকেই চলেছে দেশ ছেড়ে চিরকালের মতো। এই ডামাডোলে বেরোবার অনুমতি জোগাড় করাও সহজ নয়। বাস-স্টেশনের টুকিটাকি আলাপের মধ্যে দিয়ে আশির দশকের ইরানের এলোমেলো জীবনের ছবি ফুটে ওঠে স্পষ্ট হয়ে। জালাল তো যাচ্ছে শুধু ভাগ্নীর চিকিৎসার দেখাশোনা করার জন্য, দেশ ছেড়ে নয়। তার একসিট পারমিট জোগাড় করতে অন্যদের মতো অত ঝামেলা হয় নি। ইরানের বিমানবন্দরগুলো সব বর্তমানে বন্ধ। তাই যাত্রীদের বেরোতে হচ্ছে বাসে, ইস্তানবুলের পথে। সম্ভব হলে টারকিশ এয়ার-এর কোনো বিমানে ইরান এয়ার-এর যাত্রী হিসেবে যদি যাওয়া যায় তার চেষ্টায়। যাত্রাপথের অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে শেষ পর্যন্ত রেসিলকয় বিমান-বন্দর থেকে ফ্লাইট নং ৬১৬-তে পারীর দিকে যাত্রা করে জালাল। নভেমবরের এক ঝিরঝিরে বৃষ্টির ঠাণ্ডা সন্ধেবেলায় এসে পৌছয় পারীতে। অর্লি বিমানবন্দরে বেরোবার মুখে দেখা হয়ে যায় তেহরানের স্কুলের সহপাঠী নাদের পার্শির সঙ্গে। নাদের আজ প্রতিষ্ঠিত কবি লেখক নাট্যকার অনুবাদক এবং মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা। সঙ্গে তার আমেরিকান স্ত্রী সারা। এই নাদের পার্শির সূত্রেই জালাল জড়িয়ে পড়ে ছিন্নমূল বুদ্ধিজীবীদের ওই ঘূর্ণিচক্রে। বিমানবন্দরের সংক্ষিপ্ত আলাপ-পরিচয়ের মধ্যেই জালাল জেনে নেয় নাদেরের সঙ্গে লায়লা আজাদীর যোগাযোগ আছে কিনা এখনো। এই জেনে-নেওয়াটুকু তাৎপর্যপূর্ণ।

লায়লা আজাদী নামের এই মহিলা রূপসী। পারসিক সংস্কৃতি-জগতে একটা নামের মতো নাম। নিজের রচনায় তিনি প্রতিভার ছাপ রেখেছেন, স্বীকৃতিও মিলেছে। কাফে দ্য লা সাঙ্কশিয়ঁর চক্রে তিনি কিছুটা মক্ষিরানীর ভূমিকা পালন করেন। জালালের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক এক সময়ে ছিল। আজও তার উষ্ণতা সবটুকু হয়তো হারিয়ে যায় নি। কিন্তু মাঝখানে দুস্তর শীতল জলাশয়। এবম্বিধ সম্পর্ক ইতিমধ্যে তাঁর আরো অনেকের সঙ্গেই গড়ে উঠেছে। তবুও জালাল আজও তাঁর জীবনে যেন কিছু একটা। যদিও জালালের দিক থেকে আজ আর ভুল ধারণার মোহ বিশেষ অবশিষ্ট নেই। তবুও পারীর এই আলোকিত ঘূর্ণির মধ্যে যেন দুজনে দুজনের কাছাকাছি আসতে চাইবার একটা ব্যাপারও রয়ে গেছে। কোমাগ্রস্ত সরাইয়া যেমন একটা প্রতীকের কাজ করে, তেমনি লায়লা আজাদীও এই উপন্যাসে একটা প্রতীক হয়ে ওঠে। রূপ গুণ ক্ষমতা প্রতিভা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে লায়লার জীবন ছন্নছাড়া। সম্পূর্ণ রিক্ত জীবনে চাপা যৌন আর্তিতে সে আজ ক্লিষ্ট। বিমানবন্দরেই নাদেরের মুখে জালাল জেনে যায় তার কী একটা অসুখ করেছিল, হাসপাতালে ছিল, এখন ফিরেছে। এই অসুখের প্রসঙ্গে পরে সে নিজে জালালকে বলে, সব অসুখের কথা বলা যায় না। তার লক্ষ্মীছাড়া জীবনের নানা পর্বের প্রণয়-আধা-প্রণয়ের কোথাও কোনো শারীরিক বিশ্বাসঘাতকতার বেদনা লুকিয়ে আছে এই অসুখের মধ্যে। জালাল সেকথা পরিষ্কার জানে নি কখনো। উপন্যাসের দিক থেকেও তার প্রয়োজন নেই।

এই উপন্যাস আসলে জীর্ণতার উপন্যাস। সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে কেমন যেন সব। এই বিবর্ণ ধূসরতায় মিলিয়ে যাবার কাহিনী সূক্ষ্ম শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হয়ে আছে উপন্যাসের সমস্ত শরীরে। গল্প যত এগোয় ততই যেন সবকিছুর ভেতরের শূন্যতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। শুরুতে মনে হয়েছিল পারীপ্রবাসী এই বুদ্ধিজীবীর দল বুঝি-বা কোনো প্রশ্নে বিদ্ধ। তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে পরিচয় বাড়লে আমরা বুঝতে পারি ওসব কিছু না। তারা সব আটকে আছে ব্যক্তিগত সংকীর্ণ ছোটো-ছোটো পাওনাগণ্ডার হিসেবনিকেশের সীমানায়। দেশকাল থেকে

বাইরে-টেনে-বার-করা একমুঠো নিষ্প্রাণ পুতুল যেন সব। কিছুই আর তাদের জাগাবে না আজ। মদ্যপান, নারীসঙ্গ-লিপ্সা, ঈর্ষাকাতরতা, ইরানি মুদ্রার পাচার ইত্যাদিতে আজ সবাই বদ্ধ। এমনিভাবে উপন্যাস এগিয়ে চলে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে। এর সবচেয়ে শিল্পসম্মত বিন্যাস আছে ভার্সাই ভ্রমণের দৃশ্যে।

কাফে দ্য লা সান্ধ্যশিল্পর গোটা দলটাই ভার্সাই বেড়াতে যাবে। বৃষ্টির মধ্যে ভার্সাই স্টেশনে নামল জালাল আর লায়লা। স্টেশনের অদূরে এক কাফেতে মিলিত হচ্ছে সবাই। এই বেড়ানোটা যে কী দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত তার একটা অগ্রিম ইঙ্গিত আছে একেবারে শুরুতে—আব্বাস হেকমত আর নাদের পার্শির তর্কে। এঁরা দুজন কেউ কাউকে পছন্দ করেন না। আলোচনা চলছিল আমানুল্লা হোসেন, শপ্যা আর চাইকোভস্কির সংগীত নিয়ে। নাদেরের মতে হোসেন বাকি দুজনের চেয়ে ভালো না হলেও অন্তত খারাপ নয়। হেকমতের কাছে এ-তুলনা হাস্যকর। এর উত্তরে নাদের সরাসরি আক্রমণের উদ্দেশ্যে তুলনা করে বসে হেকমতের উপন্যাসের সঙ্গে তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'-র এবং কাফকার 'রূপান্তর'-এর। তাদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব এগিয়ে চলে ভার্সাই-এর ল্যা শাত্যোর প্রাচীন শিল্পনিদর্শন দেখতে গিয়েও। সপ্তদশ শতকের এই ক্যাসল-এর ঐতিহাসিক মর্যাদার প্রতিতুলনায় পারশি আর হেকমতের হাতাহাতি একটা চটকা ভাঙার কাজ করে। চোদ্দ পনেরো বছর আগে এক সাহিত্যপত্রিকায় পার্শির নাটকের সমালোচনা বেরিয়েছিল এই বলে যে, এ-রচনা সর্বতোভাবে ইউরোপ-প্রাণিত। হেকমত সেই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। সেই থেকে দুজনের বিষিয়ে-যাওয়া সম্পর্ক আর মজবুত হয় নি। সেই ভুল-বোঝাবুঝি আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। জাদুঘরের ভিনাস ও লা পুদিচিতের নিউডের নিস্তব্ধতার মধ্যে দুজনের হাতাহাতির বর্ণনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সময়ের কথা। বিপ্লবোত্তর ইসলামি ইরান ও তার প্রবাসী বুদ্ধিজীবী আজ এই মৌষলপর্বে এসে পৌঁছেছে।

একটা প্রশ্ন জাগে। এসবের মধ্যে কি লেখকের কোনো সমালোচনা প্রচ্ছন্ন রইল? এ কেমন বিপ্লব, যা বুদ্ধিজীবীদের এমনি করে দূরে ঠেলে দেয়? আর এ কেমন বা বুদ্ধিজীবী, যারা দূরে বসে দূরে সরেই থাকে?

সৌরীন ভট্টাচার্য

সংগীত

ক্যাসেট পাইরেসি ও আনুষঙ্গিক সমস্যা

"জাল ক্যাসেট কিনবেন না। জাল ক্যাসেটে বাজার ছেয়ে গেছে।" দি গ্রামোফোন কোমপানি অব ইনডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত এই সময়োপযোগী স্লোগানগুলি আপনি শোনেন নি বা দেখেন নি, এমন নয়। বেতারে, দূরদর্শনে, কাগজে, হেডিং-এ, পোসটারে চতুর্দিক ছয়লাপ!

"ক্যাসেট পাইরেসি" ভারতবর্ষে একটি নতুন উপদ্রব। এই দস্যুতা দমন করতে রেকর্ড-ক্যাসেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোমপানিগুলি আজ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। মিটিং, কনফারেন্স, সেমিনার করে দেশবরেণ্য সংগীতশিল্পীদের স্বাক্ষর-সমন্বিত আবেদন দৈনিকের, সাপ্তাহিকের পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করে এবং আইনানুগ ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেও এই প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিজ্ঞাপনের সূত্র থেকে জানা যায় কোমপানির আয় এবং শিল্পী, গীতিকার, সুরকারদের রয়ালটি বাবদ প্রাপ্য আর্থিক অবস্থা সুরক্ষিত থাকছে না। লোকসানের দায় থেকে কোনোভাবেই আর কোমপানিকে বাঁচানো যাচ্ছে না। সরকারি আইন অনুযায়ী পাইরেসি এক দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু ক্যাসেট দস্যুরা তাতে দমেন নি। বিনা লগ্নীতে, বিনা অনুমতিতে শুধু একটা কপিয়ার মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন কোমপানির জনপ্রিয় শিল্পীদের রেকর্ডে-ক্যাসেটে গাওয়া বহুল-প্রচারিত গান চাহিদানুযায়ী ছেপে যাচ্ছেন হাজারে হাজারে। সেইসব ক্যাসেট দামেও সস্তা। তাই ক্রেতার অভাব হচ্ছে না। ঘরে-ঘরে ক্যাসেট রেকর্ডারের প্রচলন হয়েছে খুব। প্লাগ লাগিয়ে চালিয়ে দিলেই হয়!

'জাল ক্যাসেটে বাজার ছেয়ে গেছে'—কথাটি প্রত্যক্ষভাবে দুঃখজনক মনে হলেও পরোক্ষভাবে স্ববিরোধী। এ দায় থেকে কোমপানিগুলি নিজেদেরও মুক্ত রাখতে পারেন না। তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে কারণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

কিছু হিসাবের গরমিল, কিছু কারচুপি যে একদা কোমপানিগুলি করেন নি, এমন নয়। তবে তা গোপনে। তার হদিস রেখেছেন কে? সেই গোপন পথেই পাইরেটরা আজ কোমপানিগুলির ব্যাবসার অনেকটাই দখল করে নিয়েছেন। দুটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। শুধু কোমপানি বদল করে দুজন ভারতখ্যাত শিল্পী এক বছরেই তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

১) আমার পূজার ফুল: শিল্পী কিশোর কুমার। প্রকাশক: মেগাফোন।

২) আজ শুধু এইটুকু থাক: শিল্পী লতা মঙ্গেশকর। প্রকাশক: ইনরেকো।

উপরোক্ত দুই শিল্পী গ্রামোফোন কোমপানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। মাত্র এক বছরের জন্য তাঁদের অন্য কোমপানিতে আগমন কি শুধু হাওয়া বদলের জন্য? দেখা যায়, রেকর্ড দুটি অন্যান্য বছরের এইচ. এম. ভি. প্রকাশিত রেকর্ডের তুলনায় বিক্রি হয়েছে বহুগুণ বেশি। এবং এই দুই শিল্পী পুজোর গানের ব্যাপারে সেই থেকে অনিয়মিত। পুজোয় বাঙলা গানের রেকর্ড করতে তাঁরা আর তেমন উৎসাহ বোধ করছেন না।

পাইরেসি তো অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। যখন পাইরেসি ছিল না, ব্যাবসা যখন কোমপানিগুলির মনোপলি ছিল, তখনকার রেকর্ড বিক্রির হিসাব আর এখনকার হিসাবে এত তারতম্য হয় কী করে? হঠাৎ করেই কি বাঙালি ভীষণভাবে সংগীতপ্রবণ হয়ে উঠেছে?

এতকাল গান বিক্রির যে হিসাব কোমপানিগুলি সংশ্লিষ্ট প্রাপকদের রয়ালটির ভিত্তিতে পেশ করতেন, পাইরেসির ফলে দেখা যাচ্ছে, যে-কোনো নামি শিল্পীর যে-কোনো গানের ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে তার দশ গুণ কিংবা তারও বেশি। এ বিষয়ে কোমপানিগুলি কী বলবেন? তাহলে বাঙলা গানের চাহিদা কমে গেছে বলা যায় কি? কোমপানিগুলি যা পারছেন না, রাস্তার দোকানদার তা অবলীলায় পারছেন কী করে? কলকাতা এবং মফস্সলের আনাচে-কানাচে পান-বিড়ির দোকানের মতো এত "ক্যাসেট ভাণ্ডার" গজিয়ে ওঠে কেন? অথচ শুনি সেলস প্রমোশনের জন্য দক্ষ ব্যক্তিরা দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছেন কোমপানির ঠাণ্ডাঘরে বসে! এর উত্তরে কোমপানি যা বলেন তা হল, বিনা লগ্নীতে দস্যুদের পক্ষে সস্তা দরে ক্যাসেট বিক্রি করা যতটা সহজ, কোমপানির পক্ষে সেই চিন্তাধারা অবাস্তব। কারণ বৃহৎ এসটাব্লিশমেন্ট, চালিয়ে, রেকর্ডিং কস্ট, লেবার কস্ট, ইলেকট্রিক্যাল কস্ট, শিল্পী, যন্ত্রী, গীতিকার, সুরকারদের প্রাপ্য মিটিয়ে যে দাম প্রতিটি

ক্যাসেটের জন্য ধার্য থাকে, তা থেকে দাম কমিয়ে দস্যুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা হঠকারিতারই নামান্তর। এই ভ্রান্ত নীতি কিন্তু পরোক্ষে পাইরেটদেরই মদত দিচ্ছে। কারণ চাহিদার ঘাটতি নেই, এবং তা পূরণ করছেন পাইরেটরাই।

দেখেশুনে মনে হয়, মারকেটিং বিষয়ে কোমপানিগুলি সঠিক তথ্য দিচ্ছেন না। পদাধিকারীর সংখ্যাধিক্য, ব্যক্তিত্বের ঠাণ্ডা লড়াই, প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্যই ব্যাবসা আজ চলে গেছে দস্যুদের হাতে!

রাস্তার দোকানগুলি যেভাবে কম দামে ক্যাসেট বিক্রি করে কোমপানিগুলির প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে, একটু কর্মপটুত্ব থাকলে সেলস প্রমোশনের মাধ্যমে তা দমন করা কঠিন ছিল না। সরবরাহ বাড়িয়ে মূল্য কমালেও মুনাফায় ঘাটতি হত না এবং পাইরেসির সুযোগ খর্ব করা যেত। পরিকল্পনার অভিনবত্বে পাইরেটরা যেভাবে মারকেট ক্যাপচার করে থাকেন, তেমন আদর্শ অনুসরণ করে কোমপানিগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছেন। গান সাজানো বা কমপাইলেশনের ক্ষেত্রে এদের উদ্ভাবনী শক্তি অবহেলার বস্তু নয়। অর্থাৎ ক্রেতার রুচির সঙ্গে আত্মীয়তা সৃষ্টিতে এঁদের পরিকল্পনা সর্বাংশেই সার্থক।

পাইরেসি নানাভাবে সংঘটিত হয়। কয়েকটি প্রচলিত ধারার উল্লেখ করা যাক।

১) এতে প্রযোজক, পরিবেশক বা কোনো কোমপানির নামের উল্লেখ থাকে না। কাজটি অত্যন্ত দায়সারাভাবে সম্পন্ন হয়। শিল্পীর একটি ছবি ক্যাসেটের বাকসের মধ্যে থাকে যা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কভারের সেই ছবির নীচে শিল্পীর নাম উল্লিখিত না হলে ছবি দেখে শিল্পীকে শনাক্তকরণ দুরূহ। অবশ্য গানের একটি মুদ্রিত তালিকা থাকে। যে-কোনো লং-প্লে রেকর্ডের ট্রু কপি হিসেবে এই চোরাই সংস্করণগুলি তৈরি হয়ে থাকে। এই ক্যাসেটের দাম সাধারণত ১৬ টাকা।

২) ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন রেকর্ড থেকে একই শিল্পীর গাওয়া গান কিংবা বিভিন্ন শিল্পীর গান চয়ন করেও ক্যাসেট প্রস্তুত হয়ে থাকে। এতে কভারে ছবি থাকে না। গানের তালিকা ক্যাসেটের ইনডেক্স কার্ডে হাতে লিখে দেওয়া হয়। আলাদা ভাবে খাটতে হয় বলে এবং ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী গান সংগ্রহ করতে হয় বলে সারভিস চারজ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হয়। এর মূল্য দাঁড়ায় ১০+১৬=২৬ টাকা। পাইরেট ছাড়াও ছোটোখাটো ডীলাররাও এই ব্যাপারটি করে থাকেন। বাঙলা গানের ক্ষেত্রে এই রীতিটির বেশি প্রচলন।

৩) হিন্দি চলচ্চিত্রের গানের চাহিদা সব থেকে বেশি। তাই সস্তা দামের, নিম্নমানের ক্যাসেট বহুল পরিমাণে রাস্তায় ঢেলে বিক্রি হয়। এর জন্য কোনো বাক্স বা কনটেনারেও প্রয়োজন হয় না অনেক ক্ষেত্রে। স্তূপীকৃত ক্যাসেট থেকে বাছাই করে তুলে নিলেই হয়। মূল্য সুলভ। বাকস ছাড়া প্রতি ক্যাসেটের মূল্য ৮ টাকা। বাক্সসহ ১২ টাকা।

৪) এই ধারাটি পুরোপুরি জালিয়াতি। অর্থাৎ কোমপানি-পরিবেশিত রেকর্ড বা ক্যাসেটের হুবহু নকল সংস্করণ। কভার ডিজাইন থেকে শুরু করে টেপ আর তার কনটেনারটি পর্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত। টেপের কোয়ালিটি এবং সাউনড ক্ল্যারিটিতে যা কোনোভাবেই নগণ্য নয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কোমপানি-প্রকাশিত ক্যাসেটের চাইতেও এর মান আরও উন্নত। হাইলেভেল, হাই-গেন সমন্বিত এবং নির্ভরযোগ্য। এই ধারাটিই মারাত্মক এবং কোমপানিগুলির সবিশেষ আতঙ্কের কারণ।

সাবধানী ক্রেতা যাঁরা বেশি দামে অরিজিন্যাল ক্যাসেট কেনার পক্ষপাতী প্রধানত তাঁরাই হন এর শিকার। কারণ সাবধানী ক্রেতা সব সময়ই অথরাইজড ডিলারের থেকেই ক্যাসেট কিনে থাকেন। ডীলাররা এইসব নকল বা জাল ক্যাসেটে কমিশন পান বেশি। মানেও তা উৎকৃষ্ট বলে সহজে অথরাইজড ডীলাররা কোমপানিগুলিকে সন্তুষ্ট রেখেও ওইসব জাল ক্যাসেট আমদানি করেন অধিক পরিমাণে এবং কোমপানির কাছে বিষয়টি গোপন রাখেন। কোমপানিগুলি এসব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছেন।

জালিয়াতির ব্যাবসা হলেও এই ধরনের দুষ্ট ব্যবসায়ীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত প্রতিষ্ঠান থাকা স্বাভাবিক; লোকবল, অর্থবল এবং প্রযুক্তিগত কৌশলে যে-কোনো বৃহৎ কোমপানির সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান বলেই যা গণ্য হতে পারে। এঁদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্য তো কোমপানিগুলির "জাল ক্যাসেটে বাজার ছেয়ে গেছে"—এই কথাটিতেই প্রমাণিত!

শুনতে পাই, সূত্র আবিষ্কারের জন্য সন্ধান চালিয়ে কোনো বৃহৎ কোমপানির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার দিল্লীতে এইরকম একজন জাল ক্যাসেট ব্যবসায়ীর সন্ধান পান। সশরীরে সাক্ষাৎ না ঘটলেও টেলিফোনে ব্যক্তিটির সঙ্গে কোমপানির পদাধিকারীর দীর্ঘ তপ্ত আলোচনা হয়। কিন্তু সে আলোচনা ফলদায়ক হয় নি। কারণ ওই চোরাকারবারির আরোপিত শর্তে কোমপানির রাজি হওয়ার অর্থ বে-আইনি এবং অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। শর্ত: মোটা কমিশনে ব্যাবসার দায়িত্ব, চাহিদানুযায়ী সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং বিরাট একটি অঞ্চলের রেকর্ড-ক্যাসেট বিক্রির অধিকার পাওয়ার পরিবর্তে তার নিজস্ব গোপন ব্যাবসা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতিদান।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অথরাইজড ডীলার থাকা সত্ত্বেও নিয়মবহির্ভূত এমন একটা শর্তে রাজি না হওয়াই কোমপানির পক্ষে স্বাভাবিক। এই অনুমোদনের অর্থ দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া। তা ছাড়া যাকে দমন করতে এত সব তৎপরতা তার সঙ্গেই ব্যবসায়িক আঁতাত করাটাও সম্মানজনক নয়।

অতঃপর পাইরেসি দমন করতে কোমপানিগুলি সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বলে একটি ফরমুলা বার করেন। জেনুইনিটির প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক ক্যাসেটের বাক্সের উপর সরকার-প্রদত্ত একটি স্ট্যামপ লাগানো থাকবে। যেমন থাকে দিয়াশলাই-এর বাকসে বা সিনেমার টিকিটে। অবশ্য এর জন্য সরকারকে কর দিতে হবে। ব্যবস্থাটি সৎ প্রচেষ্টার নজির নিশ্চয়। এই ব্যবস্থায় কোমপানিগুলিতে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলেও, তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারলেন না। পাইরেসি চলতেই থাকল। শুধু কিছু আদর্শবাদী ক্রেতা যারা জেনুইনিটির পৃষ্ঠপোষক, তাঁরাই এতে সন্তুষ্ট হলেন। এতে অসাধু ব্যবসায়ীদের সামান্য ক্ষতি হলেও সমূহ ক্ষতি হল না। কারণ স্বল্প মূল্যে ক্যাসেট ক্রেতার কিছু অভাব নেই।

দুর্নীতিমূলক অবৈধ ক্যাসেট পাইরেসির এই বিষয়টি বিজ্ঞাপনে প্রচারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এইসব জাল ক্যাসেট-ব্যবসায়ীরা একটু হাসিঠাট্টার শিকার হলেও তা গায়ে মাখলেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে, সচেতনভাবে তাঁরা যে ব্যাবসাটি করছেন তার পিছনে বৈধতার একটা প্রশ্ন আছে।

অনেক সময় রেকর্ড-ক্যাসেট প্রস্তুতকারক ছোটো-ছোটো বৈধ কোমপানিগুলি যেখান থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করান, সেখানে আঁতাত করেও পাইরেটরা তার নকল বার করে নিয়ে যাচ্ছেন সহজেই। এমন প্রমাণ আছে। একমাত্র গ্রামোফোন কোমপানির নিজস্ব প্ল্যান্ট থাকায় এ ব্যাপারে তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হন। বাকি যাঁরা ছোটো-ছোটো কোমপানি বহুদিন ধরে রেকর্ড-ক্যাসেটের ব্যাবসা করে আসছেন, তাঁদের হয় গ্রামোফোনের ফ্যাকটরি অথবা দিল্লী বা বমবের কোনো ফ্যাকটরিতে প্রস্তুতিকাজের জন্য শরণাপন্ন হতে হয়। আজকাল কলকাতায়ও হচ্ছে।

গত বছর দেওয়ালি উপলক্ষে এইরকম একটি ছোটো কোমপানি একজন খ্যাতনামা শিল্পীর গজল গানের ক্যাসেট প্রকাশে উদ্যোগী হন। কিন্তু দেখা যায়, দেওয়ালির বহু আগেই তা কলকাতার বাজারে গোপনে বিক্রি হতে শুরু করেছে। ওই শিল্পীর গানের চাহিদা রয়েছে খুব। বাজার তেজি। এই ক্যাসেট তৈরি করার জন্য বমবের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোমপানির চুক্তি ছিল। কোমপানির এক প্রতিনিধি বাজারে আনাগোনার সূত্রে তা আবিষ্কার করেন। বিষয়টি লালবাজারে পুলিসের সদর দপ্তরে জানালে, তাঁদের সহায়তায় বহু ক্যাসেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়—আইনমোতাবেক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবেও পুলিসের তৎপরতায় বহু জাল ক্যাসেটের কারবারি ধরা পড়েন। এই দুষ্টচক্রের জাল কত দূর বিস্তৃত, এই ঘটনা তার একটি নজির।

বিভিন্ন সময়ে এই ধরপাকড়ের ঘটনা ক্যাসেট-পাইরেটদের স্বস্তিতে ব্যাবসা করার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। অতএব তাঁরা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তনের কথা ভাবতে থাকেন। তাই কিছু দিন ধরে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নিজস্ব কোমপানি তৈরি করে, তারই নামে বৈধ ব্যাবসার আয়োজনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পীকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গানও রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু প্রবীণ নামকরা শিল্পীও এতে যোগদান করেছেন। নতুনরাও আসছেন। তাঁদের অনেকেই অর্থমূল্যে এই প্রয়াসে যুক্ত হতে দ্বিধা করছেন না—যদি এতে কেরিয়ার তৈরি হয়। বড়ো কোমপানিতে ধরনা দিয়ে যখন এঁরা কোনো সুযোগ পান না, তখন এরকম একটি ব্যবস্থা তাঁদের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহজ রাস্তাই খুলে দেয়।

ক্যাসেট-রেকর্ডিঙের সাম্প্রতিক এই আয়োজনে নামি শিল্পীদের সঙ্গে যদিও কাগজেপত্রে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে না, তবুও রয়্যালটির প্রশ্ন থাকাতে দুই পক্ষের মধ্যে একটা

বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে এককালীন অর্থ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি "ফুল অ্যানড ফাইনাল সেটুল্‌মেন্‌ট্‌" বলে কার্যকর হয়। শিল্পী, সুরকার, গীতিকার—সবাইয়ের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। বিভিন্ন যন্ত্রীদের প্রাপ্য অর্থ এঁরাই দিচ্ছেন।

বড়ো কোমপানিগুলি যেখানে জনপ্রিয় শিল্পীদের রেকর্ড-ক্যাসেট চালানো রিস্‌ক্‌ বলে মনে করছেন, সেখানে ছোটো ব্যবসায়ীদের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ভাবিয়ে তোলার মতো ব্যাপার।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তা অনুমান করা যায়। "বড়োলোকের বিটি লো" একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পুজোর উপহার ছিল। গানটি বাজার মাত করার পর গ্রামোফোন কোমপানি এই শিল্পীটির মধ্যে প্রবল সম্ভাবনা দেখতে পান, আর তাঁকে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। শিল্পীর বর্তমান অবস্থা কতটা আশাপ্রদ বলা শক্ত।

বাঙলায় কিছু কিছু নবীন লোকসংগীতগায়কও এইসব খুদে কোমপানির প্রেরণায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এইসব গানের ক্যাসেটের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ, বড়ো কোমপানির নামি শিল্পীদের রেকর্ড বিক্রির আর্থিক উপার্জনের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

এইসব ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে খুদে ব্যবসায়ীরা (একদা পাইরেট) নিজস্ব ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এবার পুজোয় বড়ো-বড়ো কোমপানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছেন। অথচ মজা এই যে, এই খুদেরা বড়োদের সম্পদে চোরাই ব্যাবসা করে ইতিমধ্যে যে মুনাফা ঘরে তুলেছেন, তারই জোরে আজকের এই অভিযানে নামার শক্তি অর্জন করেছেন।

ডিস্‌কোর যুগ শেষ। ঝামেলা এতে প্রচুর। গান রেকর্ডিং করা, মিক্‌সিং করা, ট্রান্‌স্‌ফার করা, তা থেকে ওয়াক্‌স্‌ প্লেটে ছাপ ফেলে স্ট্যাম্‌পার তৈরি করা, লেবেল ছাপানো-বসানো, প্রেসিং ইত্যাদি নানা সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা সম্পূর্ণ হয়। ব্যাপারটা ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ।

ক্যাসেটে এত ঝামেলা নেই। গান রেকর্ড করার পর মাস্‌টার্‌ ক্যাসেট তৈরি করে তা থেকে যত খুশি ছেপে নেওয়া সম্ভব—এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। হাই-স্পীড কপিয়ার মেশিনে মাত্র দেড় থেকে দু মিনিটে ছটি থেকে দেড়শটি পর্যন্ত ক্যাসেট ছাপানো যেতে পারে। সম্প্রতি দিল্লীতে একটি প্রতিষ্ঠান কোটি টাকা খরচ করে একটি অত্যাধুনিক বিদেশী মেশিন আমদানি করেছেন যাতে চল্লিশ হাজার ক্যাসেট প্রিন্‌ট্‌ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এঁরা উন্নত মানের ক্যাসেটে ব্যবহৃত টেপও তৈরি করতে পারেন। ওই সিরিজের টেপ অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের প্রভূত আস্থা অর্জন করেছে। সেই টেপেরও জাল সংস্করণে বাজার ছেয়ে গেছে। এঁরাও সেই জাল ক্যাসেট না কিনতে জনসাধারণের উদ্দেশে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল: এত যে গান বেরোচ্ছে, তা কিনবে কে? নামি শিল্পীদের গান না-হয় নামে কাটবে। নতুন যাঁরা এলেন, টাকা ঢাললেন, তাঁদের অবস্থা দাঁড়াবে কেমন? ক্যাসেট-বিক্রেতারা হয়তো কাগজে বিজ্ঞাপন অথবা বেতারের মাধ্যমে প্রচার চালাবেন। কিন্তু নাম-না-জানা শিল্পীদের গায়কি এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় জনমনে তা কতটুকু আগ্রহ সঞ্চার করবে? অবশ্য গানে যদি মেরিট থাকে, তবে রাস্তার দোকানে লাউডস্পীকারে বাজালেও গান ধরে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিনা প্রচারে, বিনা বিজ্ঞাপনেই তো "মিলনোড়ি বিন্‌ চাটনি" সুপারহিট হয়ে গেল!

সব গানই অবশ্য সমানভাবে উতরে যাবে না। কারণ, এবার পুজোয় গানের সম্ভারে যে বিপুলতা, তা অতীত দিনের সমস্ত হিসাব ম্লান করে দেবে। তাই, সাবান-টুথপেস্‌ট্‌-বিক্রেতাদের মতো বাড়ি-বাড়ি ক্যাসেট বিক্রি করার জন্য শিল্পী-প্রতিনিধিরা যদি হাজির হন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নতুন শিল্পীরা নিজের-নিজের গানের ক্যাসেট পরিচিত জনের কাছে নিশ্চিতই "পুশ" করবেন, আবার অপরিচিত মানুষের দ্বারেও। ব্যবসায়ীদের অপরিণামদর্শিতায় সংগীতশিল্প যেমন পণ্যে রূপান্তরিত হল, আগামী দিনের সিঙ্গারের তেমনি হকার হতেই বা আপত্তি কোথায়!

এই নতুন উদ্যোগে কিছু নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বিষয়টি আশাব্যঞ্জকও। এভাবেই মনোপলির বিরুদ্ধে একটা সুস্থ-সুন্দর আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হওয়ার নয়। কারণ, টাকা ঢাললেই যেখানে গান গাওয়ার সুযোগ থাকছে, সেখানে মাননির্ণয়ের কোনো সুযোগ থাকবে না, বলাই বাহুল্য। নিয়ন্ত্রণ না থাকলে উঁচু মানের শিল্পের সৃষ্টি হবে, এমন আশা করাই ভুল। তবু দেখা যাক এই "হাওয়াবদলে" বাঙলা গানের স্বাস্থ্যোদ্ধার ঘটে কি-না। অল্পসংখ্যক সম্ভাবনাময় গীতিকার-সুরকার-শিল্পীর ও সন্ধান যদি মেলে সেটাই হবে উপরি পাওনা।

ক্যাসেটের এই ঢালাও কারবারে কলকাতার যন্ত্রসংগীত-শিল্পীদের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। শিল্প ডুবে যাক, প্রযোজক সর্বস্বান্ত হোক, তবু তাঁদের পাওনা ফ্লোরেই মিটিয়ে দিতে হবে। একটা ক্যাসেট মানেই তো দশ থেকে বারোখানা গান! ভাবা যায়!

আর আছে গলিতে-গলিতে গজিয়ে-ওঠা সাউনড স্টুডিও। ঘণ্টায় ৭৫ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া। সেখানে কী না হচ্ছে! যাত্রা-থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের প্রোগ্রাম, প্রসাধন-সামগ্রীর প্রচারমূলক অনুষ্ঠান, গীতিনাট্যের গান, আবৃত্তি এবং রেকর্ড ক্যাসেটের গান। ডেট পেতে রীতিমতো ধরনা দিতে হয়।

একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, এইসব নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রযোজকেরা জোর দিচ্ছেন লোকসংগীতের উপর। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, লোকসংগীতের জনগ্রাহ্যতা সবথেকে বেশি। তাই যাঁরা কখনো লোকসংগীত করেন নি, শুধু রেকর্ড করার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে নিজের টাকা খরচ করেও তাঁরা লোকসংগীত গাইতে রাজি হয়ে যাচ্ছেন। কারণ, আধুনিক গানের নাকি তেমন বাজার নেই। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল—এঁদের গানের জন্য অনুমতি পাওয়াই দুষ্কর।

লোকসংগীত বলতে ঐতিহ্যবাহী পারম্পরিক ধারার গান নয়। তারও নাকি বাজার নেই! এ ধারণা বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরং ভ্রান্তিমূলক। যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তা হল, অজ্ঞাত-পরিচয় লোককবির গান করলে কথা আর সুরের জন্য কোনোরূপ লেনদেন বা রয়্যালটির প্রশ্ন ওঠে না। শুধু "ট্র্যাডিশনাল" আখ্যা দিলেই সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি। কিন্তু যাঁরা এই উদ্যোগে শরিক হচ্ছেন, অর্থাৎ গীতিকার-সুরকাররা, তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন না কি? এটাও ভেবে দেখার। তা না হলে বাঙলার ট্র্যাডিশনাল সংগীতের কথার বাঁধুনির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা কজনের আছে? এমন সুযোগ হাতছাড়া করার উদারতা আশা করাও যায় না। তাই ট্র্যাডিশনাল গানের আদলে বা ওই-জাতীয় গান ভেঙেই রূপ নিচ্ছে নানা ধরনের লোকগীতি, যাকে কোনো আঞ্চলিক গানের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। কথা-বস্তুর চরিত্র বা পটভূমি গ্রামঘেঁষা হলেও, কিংবা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে তাকে সাজালেও তা শহুরে পালিশে মার্জিত। এতে কোনো তত্ত্ব থাকে না, সুরে কথায় ঘটে যায় নানা মিশ্রণ, এবং আধুনিকতার প্রলেপে অভিনবত্ব আরোপের দিকেই ঝোঁকটা থাকে প্রবল। আবহসৃজনে ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রুমেনটের কায়দা কসরত। তার মুখ্য উদ্দেশ্য কথায় সুরে একটা তামসিক ইম্‌প্যাক্‌ট্‌ সৃষ্টি করা।

এখন কথা হচ্ছে, এই ধরনের তাৎক্ষণিক আনন্দ-বিতরণের উপাচারকে কি যথার্থ লোকসংগীত বলা উচিত হবে? ঐতিহ্য সংরক্ষণের পরিপন্থী এই আয়োজন কতটুকু নির্ভরযোগ্য? লোকসংগীত নিয়ে এই চাতুরীটি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

ট্র্যাডিশনাল লোকসংগীতের সংজ্ঞা হিসেবে "লোকগীতি" কথাটি বেশ মানানসই, এবং বহুদিন ধরে চলে আসছে। তার মর্যাদাহানি না করে বর্তমানের উদ্ভাবিত গানগুলির অন্য নাম দেওয়াই সমীচীন। "প্রাচীন লোকসংগীত"—এই টাইটল্‌ যুক্ত হলেও সমস্যার সুরাহা হবে না। কারণ, সেই প্রাচীনতার প্রমাণ কে দেবে? সাধারণত, কপিরাইট অ্যাকটের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো রচয়িতার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর তাঁর সৃষ্টিকে ট্র্যাডিশনাল বলে বিবেচনা করা হয়। আকাশবাণীর স্ট্যাটুটেও এই নিয়ম বলবৎ আছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির গানকেও নামপ্রচারের মোহে ট্র্যাডিশনাল বলে চালিয়ে দেবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে লোকসংগীতের এই ব্যাপক প্রচারের কালে এখনই এর সংজ্ঞা নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। "পুথি" কথাটা প্রাচীনতার স্বাক্ষরবাহী এবং "বই" কথাটা আধুনিকতারই প্রতীক। সেই হিসেবে প্রাচীন লোকসংগীতের ক্ষেত্রে "লোকগীতি" বর্তমানের গানগুলির ক্ষেত্রে "লোকগান"—অভিধা দুটি সুপ্রযুক্ত হবে বলে মনে করি।

পরিশেষে বলি—অবৈধ পাইরেসির গোপন ব্যাবসা থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের সাধু প্রয়াসকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। স্বীকৃত ব্যবসায়ীর পবিত্র দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বাঙলার সংস্কৃতি সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হলেই উদ্দেশ্যের সার্থকতালাভ সম্ভব হবে।

দিনেন্দ্র চৌধুরী